সন্ধ্যারাগ

সন্ধ্যারাগ

সরোজকুমার রায়চৌধুরী

টি, এস, বি, প্রকাশন
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

উৎসর্গ

শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

টি, এস, বি, প্রকাশন-এর অন্যান্য বই ঃ

সন্ধ্যারাগ

জেলের ফটক হন হন করে পার হয়ে এসেই রোহিণী হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একখানা ট্রাম তার সামনে দিয়ে ঘড় ঘড় করে চলে গেল। পিছনে চেয়ে দেখলে জেলের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে।

রোহিণীর পরনে একখানা নতুন ধুতি। গায়ে শার্ট। শার্টটার জন্যে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু ধুতিটা ঠিক সামলাতে পারছে বলে ভরসা হচ্ছে না। এরই মধ্যে কখনও কোঁচার দিক, কখনও কাছার দিক আলগা হয়ে আসছে। আট বৎসরের অনভ্যাস। জেলের মধ্যে আট বৎসর ধুতির সংগে কোনো সম্পর্ক ছিল না। জেলের মোটা কাপড়ের তৈরি হাফ-প্যাণ্ট পরেই কাটিয়েছে।

পিছনে চেয়ে দেখলে, আট বৎসর—লাল উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা যে বাড়িটার ফটক এইমাত্র তার পিছনে বন্ধ হয়ে গেল, সেই বাড়িটাতে তার জীবনের আটটা বৎসর কেটেছে। অথচ তার উপর বিন্দুমাত্র মমতা জাগেনি। আট বছর আগে এই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়িটাকে যেমন অপরিচিত, রহস্যময় এবং ভয়ংকর ঠেকেছিল, আজও ঠিক তেমনি লাগছে! ভাবতেই পারছে না, ওর ভিতর আট বৎসর সে কাটিয়েছে।

মনে হচ্ছে, বর্ষণস্নাত এই রহস্যময় অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে সে যেন স্বপ্ন দেখছে। আট বৎসর কেন, আটটি মুহূর্তও সে কোনো কালে ওর মধ্যে কাটায়নি। দৈত্যের মতো ভয়ংকর এই বাড়িটার সঙ্গে তার জীবনের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই।

তবু এই অপরিচিত বাড়িটার দিকেই রোহিণী কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মতো চেয়ে রইল। কেন কে জানে।

আর একখানা ট্রাম।

কিন্তু ওটা আর ধরা যাবে না। রোহিণী আর একটু এগিয়ে ট্রাম-স্টপের কাছে এসে দাঁড়াল।

দেখতে দেখতে আর কটি লোক সেইখানে এসে দাঁড়াল। চমৎকার স্যুট-পরা একটি ছোকরা। সতেজ শাল-শিশুর মতো ঋজু। তার পাশে একটি বৃদ্ধ। নিজে যেমন জীর্ণ, জামা-কাপড়ও তেমনি। এসে দাঁড়িয়ে একবার দেখবার চেষ্টা করলে ট্রামটা কত দূরে। তারপর চোখের চশমাটা খুলে পাঞ্জাবীর ঝুলটা দিয়ে পরিষ্কার করে আবার চোখে দিলে। তার পাশে ছোট কাপড় এবং ছোট হাফ-শার্ট-পরা একটি ছোকরা বোধ হয় কাছাকাছি কোনো বাড়ির ভৃত্য, তার পাশে......

রোহিণী প্রত্যেকের দিকে মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে দেখলে। যেন অনেক দিন স্বাভাবিক মানুষ দেখেনি। কিন্তু পিছনের লাল বাড়িটার মতো এই প্রাণী কটিও তার নিতান্ত অপরিচিত।

চারিদিকে আড়ে আড়ে চায় রোহিণী।

সবই আশ্চর্য, সবই অদ্ভুত, সবই অপরিচিত ঠেকে। আড়ে আড়ে চায়, যেন চাইতে সাহস হয় না।

একখানা ট্রাম এসে দাঁড়াল। সকলে উঠল, তার পিছু পিছু সেও। গাড়ি ছেড়ে দিতে কণ্ডাক্টর এসে যখন টিকিট চাইলে, তখন সে হতভম্বের মতো তার দিকে চাইলে।

তাই তো! কোথায় যাবে সেইটেই তো চিন্তা করা হয়নি!

জিজ্ঞাসা করলে, ট্রামটা কোথায় যাচ্ছে?

—কালীঘাট।

না কালীঘাট নয়। কালীঘাটের দিকে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওদিকে যাওয়ার কথাই ওঠে না।

তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বললে, না, না। কালীঘাট নয়, রোককে, রোককে।

ট্রাম থামতেই নেমে পড়ল।

কণ্ডাক্টর হেসে বললে, দেখবেন কর্তা। পড়ে যাবেন না যেন।

রোহিণীর ভাব-গতিক দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। দেহাতী লোক। কলকাতা বেড়াতে এসেছে।

হাজরা পার্কের কাছে।

না, কালীঘাট নয়। কিন্তু কোথায়?

সেই কথা সুস্থির চিত্তে ভাববার জন্যে রোহিণী পার্কের একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে বসল। হ্যাঁ, অন্ধকারই ভালো। আলো যেন সে সইতে পারছিল না।

সেই অন্ধকারে প্রথমেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল তার পৈতৃক বাড়ি। ভবানীপুরের সেই অনতিপ্রশস্ত রাস্তা যেখানে পার্কটার কাছ থেকে বেঁকেছে সেইখানে ফিকে হল্‌দে রঙের সেই ছোট্ট অথচ সুন্দর দোতলা বাড়িটা। জন্ম থেকে ওই লাল ভয়ংকর বাড়িটার পেটের মধ্যে ঢোকবার আগে পর্যন্ত জীবনটা কেটেছে।

রোহিণী চমকে উঠল: জীবন কি তাহলে একটা নিরবচ্ছিন্ন ধারা নয়? খণ্ড খণ্ড কুঠুরিতে বিভক্ত? একটা থেকে আর একটা অংশ দেয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন?

তা সে যাই হোক, সেই বাড়িটা। বাপ-মার মৃত্যুর খবর সে জেলে থাকতেই পেয়েছিল। এখন সেখানে কে আছে কে জানে। সম্ভবত সুচিত্রা একাই।

কিন্তু এই সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল ওই বাড়িতে একা থাকা কি সম্ভব? থাকতে পারে, যদি তার বাপ-মা সুদ্ধ এসে থাকেন।

এই সুচিত্রা, রোহিণী ভাবতে লাগল, অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা,

কোনো দিন তার সঙ্গে বনল না। বিয়ের পর থেকে জেলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত একটা দিনও না।

তখন সে সুচিত্রার উপরই রাগ করত। সমস্ত দোষ তারই ঘাড়ে চাপাত। সে অসহিষ্ণু, সে অনুদার, ঈর্ষাপরায়ণ, সংকীর্ণচিত্ত। কিছুতেই বুঝল না যে, মীনাকে ছাড়া রোহিণীর পক্ষে বাঁচা অসম্ভব। তাকে সে প্রবঞ্চনা করেনি। গোড়াতেই নিজের জীবনের সমস্ত কথা বলেছে। কিন্তু সেই যে ঘাড় বেঁকিয়ে রইল, কিছুতেই তাকে নোয়ানো গেল না।

—এই যদি তোমার মনে ছিল, তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন?

সত্যি। কিন্তু কেন যে তাকে বিয়ে করলে তা আজও রোহিণীর কাছে স্পষ্ট নয়। কৈফিয়ৎ তার হাতে অনেক আছে। কিন্তু রোহিণী নিজের মনেই জানে তার একটাও যুক্তিসহ নয়।

মীনার সঙ্গে তার ভালোবাসা আজকের নয়। রোহিণীর মনে হয়, এ ভালোবাসা এক জীবনেরও নয়। সামাজিক কারণে এই ভালোবাসাই রোহিণীর বাপমায়ের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারপরে কি করে যে কি হল তা আজও রোহিণীর হেঁয়ালি বলেই বোধ হয়, সুচিত্রা এল তাদের বাড়ি বাজনা বাজিয়ে ধূমধাম করে। দরিদ্রের সুন্দরী মেয়ে, ঘর পেয়ে বাঁচল।

কিন্তু ঘর পেয়েই সে সন্তুষ্ট হল না। হাত বাড়াল রোহিণীর দিকে। কিন্তু রোহিণী তখন কোথায়? তার নিজের নাগালেরও বাইরে। মনের উপর রোহিণীর শাসন চলল না।

দিন কতক সে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। বাইরে বাইরে। কোনোদিন ফেরে কোনোদিন ফেরে না। এইরকম অবস্থা।

বৎসরখানেক এই রকম চলার পরে রোহিণীর বাপ-মাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলেন, ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে কাজটা ভালো করেননি। সামাজিক গোঁড়ামি তো ছেলের জীবনের চেয়ে বড় নয়।

সেদিনটা যেন রোহিণীর চোখের সামনে ছবির মতো জ্বল জ্বল করতে লাগল।

অনেক দিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে ফিরে এসে রোহিণী দেখলে, বাপ শয্যাগত। (সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হয়েছিল)।

রোহিণীকে তিনি কাছে ডাকলেন। অনুতপ্ত দৃষ্টিতে কী করুণ বিষণ্ণতা!

বললেন, আমাকে তুমি মাপ করো রোহিণী। আমি ভুল করেছি। সে ভুল সংশোধনের এখনও হয়তো উপায় আছে। আমি অনুমতি দিচ্ছি, মীনাকে তুমি বিয়ে করতে পার।

রোহিণী হেসে বলেছিল, বিয়ে করা কি এখন শুধু আপনাদের অনুমতির উপরই নির্ভর করে?

—তবে?

রোহিণী আবারও হেসেছিল, এবারে অনেকটা পাগলের মতো হাসি। বেশ রূঢ়ভাবেই উত্তর দিয়েছিল, যাকে এত ধূমধাম করে আনলেন তার অনুমতি চাই না?

বটে। কিছুটা অসুস্থতার জন্যে, কিছুটা পিতৃসুলভ স্বার্থপরতায়, সুচিত্রার কথা তার মনেই আসেনি! সুচিত্রার কথা উঠতে তিনি দমে গেলেন।

দমলেন না রোহিণীর মা। তিনি বললেন, সেও রাজি হবে। তোকে বাঁচাবার জন্যে যখন আমরা রাজি হতে পারছি, তখন বৌমাও নিশ্চয় রাজি হবে।

রোগশয্যাশায়ী বৃদ্ধের স্তিমিত চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল—তুমি বলছ বৌমা রাজি হবেন।

—নিশ্চয় রাজি হবে। সে ভার আমার উপর রইল।

রোহিণী কিরকম হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। সুচিত্রা এতে

রাজি হবে, সুচিত্রা রাজি হতে পারে, এ তার চিন্তারও অতীত ছিল।

কিন্তু মা তাঁর কথা রেখেছিলেন। সুচিত্রা রাজি হয়েছিল। তাকে রাজি হতে হয়েছিল। পুত্রস্নেহাতুরা মাতার নিষ্ঠুরতা মাত্রা মানে না। সেই সীমাহীন নিষ্ঠুরতার সামনে দাঁড়িয়ে সুচিত্রার মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল—হয় সম্মতিদান নয় মৃত্যু।

সুচিত্রা মরতে চায়নি। সম্মতি দিয়েছিল।

এত কথা রোহিণী জানে না। বোধ হয় সে প্রকৃতিস্থ ছিল না। তাই সুচিত্রার মুখের সম্মতিই সে নিয়েছিল, সম্মতি দেবার সময় যে ঘৃণা তার দুই চোখে আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিল তা আর দেখেনি। সম্মতি পেয়েই সে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

কোথায় ?

মীনাদের বাড়ি।

এক বৎসর মীনাদের বাড়ি রোহিণী যায়নি। তার ধারে কাছেও না। তার মনের মধ্যেকার যে মীনা তাকেই নিয়ে মহাদেবের মতো উন্মত্তভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে। সুচিত্রার সম্মতি পেয়ে এক বৎসর পরে সেইখানে সে ছুটল।

তার ধারণা সমস্তই প্রস্তুত। শুধু তার উপস্থিতির অপেক্ষা মাত্র। সে গিয়ে পৌঁছুবে। মীনা তো রাজি হয়েই আছে। তার বাপ-মাও রাজি হয়ে যাবেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে ট্যাক্সি করে মীনাকে নিয়ে এ বাড়ি ফিরে আসবে।

মা নতুন পুত্রবধূকে, আসল পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তুলবেন। শাঁখ বাজবে, হুলুধ্বনি হবে, যেমন হয়েছিল সুচিত্রার আসার সময়।

অথচ সুচিত্রার কথা মনেই হল না। তার মনের সামনে যে ছবি, তার মধ্যে সুচিত্রা কোথাও নেই। সম্মতি দেওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে সুচিত্রা যেন হালকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। তার আর কোনো অস্তিত্বই রইল না।

তার মনের ভিতরের জগতে এবং বাইরের জগতেও, মীনা। মীনা, শুধু মীনা। তার কেউ নয় এবং কিছুই নয়।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

বড় রাস্তা পার হয়ে একটা গলি। সেখান থেকে আরও সরু একটা গলি।

কিন্তু সে সমস্ত কিছুই তার চোখে পড়ছিল না। পথ তার মুখস্থ। চোখ বেঁধে দিলেও সে যেতে পারে।

সে চলছিল। ছুটছিল বললেই চলে। যাদুমন্ত্রে অভিভূত ব্যক্তি যেমন করে চলে তেমনি করে। আজকে এই সন্ধ্যায় হাজরা পার্কে বসে এই চলাটা সে স্মরণ করতে পারলে না। চেষ্টা করেও না।

কিন্তু সে চলেছিল।

বাড়ি থেকে বড় রাস্তায়, সেখান থেকে একটা গলিতে, সেখান থেকে আরও সরু একটা গলিতে। সেখানে মীনাদের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

সামনেই আলোরমালা। মীনাদের বাড়ির সামনেই। আর বাইরের রকে বাজছিল নহবৎ।

আলোকমালার কথা ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু সানাইএর সুর অনেক দিন পর্যন্ত শুনেছে। জেলে বসেও।

রোহিণী থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

ব্যাপারটা কি? এত আলো কিসের? কিসেরই বা বাজনা?

তার মাথার ভিতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল।

এমন সময় মীনার বাবা কি করতে এদিকে এসে রোহিণীকে দেখেই চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন।

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে তাকে অভ্যর্থনা—জানালেন : এস বাবা, এস। মীনার বিয়ে, তুমি না এলে হয়! এস, ভিতরে এস।

বিয়ে! মীনার বিয়ে!

স্খলিত কণ্ঠে রোহিণী বললে, কিন্তু আমি যে নিতে এসেছিলাম।

—কোথায়?

—আমাদের বাড়ি।

ওর চোখ-মুখের ভাব, ওর কণ্ঠস্বর, ওর কম্পমান দেহ দেখে মীনার বাবার সন্দেহ হল, রোহিণী বোধ হয় সুস্থ নয়।

বললেন বেশ তো। সে আর এমন কি! বিয়ে-থা হয়ে যাক, তারপর একদিন দুজনকেই নিয়ে যাবে। সে আর বেশি কথা কি!

ভদ্রলোক আরও একবার মিষ্টি করে হাসতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হাসতে আর পারলেন না? রোহিণী হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে উঠল। তার মধ্যে কথাও কিছু ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু কথাটা বড় নয়, বড় চীৎকারটা। একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মতো চীৎকার।

এবং সেই চীৎকারের সম্মোহ ভাবটা কাটবার আগেই রোহিণী যে পথে এসেছিল, সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আবার রোহিণী ফিরে এসেছিল। তখনও আলো জ্বলছিল, নহবৎ বাজছিল। সেই আলো এবং বাজনার মধ্যে বহু লোক ছবির মতো ঘোরাফেরা করছিল।

তাদের দৈর্ঘ ছিল, প্রস্থ ছিল, কিন্তু বেধ ছিল না। ছবির মতো।

বর তখন ছাঁদনাতলায়।

অকস্মাৎ তার পিঠে আমূল বসে গেল রোহিণীর হাতের মস্ত বড় ছোরা।

প্রথমে একটা স্তব্ধতা। তারপরেই নারী এবং পুরুষের সমবেত কণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল। এবং উজ্জ্বল আলোর মধ্যে সেই

আর্তনাদ যেন বায়ুতাড়িত হাওয়ার মতো ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল…

রোহিণী পালায়নি। পালাবার চেষ্টাও করেনি। ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

গত আট বৎসর কাজের অবসরে অথবা নিরিবিলি মুহূর্তে দুটি জোড়া চোখ রোহিণীর চোখের সামনে জেগেছে—একজোড়া মীনার, নৃত্য চঞ্চল যে চোখ দিয়ে রোহিণীকে সে নিত্য অভ্যর্থনা জানাত ; অন্য জোড়া সুচিত্রার, বিষণ্ণ কিন্তু করুণ, কোমল এবং মিনতিভরা।

হাজরা পার্কের অন্ধকার কোণে রোহিণীর সামনে সেই দু'জোড়া চোখ আবার ভেসে উঠল।

কোথায় যাবে সে ?

মীনাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। তার স্বামী মারা যায়নি। চিকিৎসার পরে বেঁচে উঠেছিল। বিচার চলতে চলতেই একথা সে জেনে গিয়েছিল। জানতে ইচ্ছা করে সে কেমন আছে।

বেচারা মীনা। রোহিণী-অন্ত প্রাণ। মনে পড়ে, রোহিণীর বিয়ের খবর শুনে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। পারেনি। কিন্তু চেষ্টা করেছিল অনেকবার।

আহা ! রোহিণীর মনে সন্দেহ নেই, আজও যদি সে বেঁচে থাকে, বড় দুঃখেই বেঁচে আছে। তাকে একবার সে দেখতে চায়। কোনো সুযোগে একবার বলে যাওয়া দরকার যে, সে নিজেও সুখে নেই।

বাড়িটা চেনে না বটে, কিন্তু বিচার চলবার সময় ওর শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা জানতে পেরেছিল। মনে আছে এই জন্যে যে, ওর একটি বন্ধুর বাড়ি ওই রাস্তাতেই-৩৫ নম্বর। আর মীনার শ্বশুরবাড়ি ঠিক তার উল্টো নম্বরে, ৫৩।

সুতরাং বাড়িটা পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

দরিদ্রের সংসার। ছোট দোতলা একটা বাড়ির একতলায়, বোধ হয় ভাড়া আছে।

রাস্তার দিকের জানালায় পর্দা দেওয়া। বোধ হয়, আব্রু রক্ষার জন্যে। কিন্তু আব্রু ঠিক থাকেনি। মলিন ছেঁড়া পর্দা। লক্ষ্য করলে রাস্তা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

ভিতরের দেওয়াল মলিন। ঘরের প্রায় সমস্তটা জুড়েই খান দুই তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা। তারও উপরকার চাদর দেওয়ালের মতই মলিন এবং জীর্ণ।

সেই মলিন বিছানায় ততোধিক মলিন কয়েকটি বালিশে ঠেস দিয়ে একটি পুরুষ আড় হয়ে শুয়ে। অনুমানে রোহিণী বুঝল, মীনার স্বামী।

অনুমান করতে কিছুই কষ্ট হল না। কারণ বিছানার পা-তলার দিকে মীনা পা ঝুলিয়ে বসে। তার দুই হাঁটুর মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে।

সেই মীনা। কিন্তু অনেকটা রোগা হয়ে গেছে।

রোহিণীর মনটা আনন্দে দুলে উঠল—রোগা হবে না! মন কি ভালো আছে? তাকে একটা দিন না দেখে যে থাকতে পারত না, সে যে বেঁচে আছে, এই তো যথেষ্ট।

সহানুভূতিতে ওর মন ভরে গেল। আহা!

—আপিস থেকে ফিরতে দেরি কর কেন?

—কেন, কি হয় তাতে?

—জান না, কত ব্যস্ত হই? এই বাচ্চা মেয়েটা পর্যন্ত বুঝতে পারে, আর তুমি বুঝতে পার না?

—না।

খুশিতে পুরুষটির চোখ ঝলমল করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মীনার চোখের তারাও নেচে উঠল: আহা!

রোহিণী কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। তার চোখে যেন পলক পড়ছে না।

মীনার চোখের তারা নাচল। অবিকল তেমনি করে যেমন করে একদিন তাকে দেখলে নাচত—এতক্ষণে এলে! আসতে পারলে! আমি কখন থেকে ঘর আর বার করছি……

অকস্মাৎ রোহিণীর মনে হল, সে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সমস্ত অন্ধকার বোধ হচ্ছে। কোনোমতে টলতে টলতে ট্রামরাস্তায় এসে দাঁড়াল।

পরের পর কখানা ট্রামই তার সামনে এসে থামল আবার চলে গেল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একখানা ট্রামে উঠল।

পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনার কি শেষ আছে! কত অসম্ভব ঘটনা আমাদের চোখের সামনে অহরহ ঘটছে! সে যে একদিন খুন করতে গিয়েছিল সেই কি কম অসম্ভব। ভট্‌চাযপাড়ার দত্ত-বাড়ির ছেলে হয়ে খুনের দায়ে লম্বা মেয়াদ খেটে এল, সেও আর এক অসম্ভব।

অজ্ঞাতসারেই রোহিণীর মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল—উঃ!

তার বেঞ্চের সহযাত্রী ভদ্রলোক হেসে ফেললেন: আর বলবেন না মশাই! ছারপোকার উৎপাতে ট্রামে চড়া দায় হয়ে উঠেছে।

ছারপোকা! রোহিণী প্রথমে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সহযাত্রীর মুখের দিকে চাইলে। তারপরে ব্যাপারটা বুঝে একটু হাসলে। হেসে যেন কিছুটা সহজ হল।

সুচিত্রার সেই বিষণ্ণ, করুণ, মিনতিভরা চোখ!

আহা, বেচারা! অনেক কষ্ট এই ক'বছরে পেয়েছে। মীনা সুখে থাক। তার সুখে রোহিণী হিংসা করে না। তার জীবনে শুধু একটি কাজ রইল—সুচিত্রার সমস্ত দুঃখ দূর করা, তাকে সুখী করা। ভগবান, তাকে তুমি সুখী কর।

ট্রাম থেকে নেমে রোহিণী নিজের বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

কী শ্রী হয়েছে বাড়ির! চেনা যায় না।

নিচে কারা যেন কথা বলছে না? ওরা কারা? একতলায় ভাড়া আছে?

—শুনছেন!—গলায় জোর এনে রোহিণী হাঁক দিলে।

—কে গা? কাকে চান?

একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক আড়াল থেকে মোটা গলায় উত্তর দিলে।

—কাকে চাই? রোহিণী মনে মনে হেসে বললে!

প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এবাড়িতে ইয়ে থাকেন?

—কে?

তবেই তো মুশকিল। কি বলা যায়?

রোহিণীর তরফ থেকে সাড়া না পেয়ে স্ত্রীলোকটি নিজেই বললে যার বাড়ি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রোহিণী ধরবার মতো একটা অবলম্বন পেলে। বলতে গেলে বাড়ি তো তারই। রোহিণী আর সুচিত্রা কি ভিন্ন?

স্ত্রীলোকটি আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে, যার স্বামী খুন করে জেলে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রোহিণীর কণ্ঠস্বর এই পরিচয়ে একটু দমে গেল।

—সে তো নেই।

—কোথায় গেছে?

—সে তো আজ ক'দিন হল ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠে গেছে।

—ছেলে-মেয়ে নিয়ে! কার কথা বলছ তুমি!

—সেই তারই কথাই তো বলছি গো, যার বাড়ি।

—তার আবার ছেলে-পুলে কি গো!

স্ত্রীলোকটি এবারে ঝঙ্কার দিলে, তা হবে না গা ? সে মুখপোড়া মিনসে কি আর ফিরবে ?

তা বটে ! ফেরার কথা নয়। ফেরার আশাও করা যায় না। কিন্তু তা হলে উঠে গেল কেন ? হয় তো খবর পেয়েছে, রোহিণী ফিরছে। খবর রেখেছে নিশ্চয়ই।

রোহিণীর উপর স্ত্রীলোকটির বোধ হয় দয়া হল।

জিজ্ঞাসা করলে, তাকে কি খুব দরকার ? গিন্নি-মার কাছে ঠিকানা রেখে গেছে কিন্তু।

রোহিণী তাড়াতাড়ি বললে, না, না। ঠিকানার দরকার নেই। এমনি খবর নিতে এসেছিলাম।

রোহিণী ফিরে চলল ট্রাম-রাস্তার দিকে। ঠিকানা কি হবে ? কারও ঠিকানারই দরকার নেই তার। মীনারও না, সুচিত্রারও না। ওরা সুখী হোক, শুধু ওরা সুখী হোক !

রোহিণীর মনে হল, তার দেহটা আছে বটে কিন্তু তার ভার নেই। পালকের মতো হালকা। সেটা যে আছে তা টের পেলে যখন হঠাৎ খেয়াল হল নতুন জুতোয় পা কেটে গেছে।

সে হেট হয়ে জুতো খুলে বগলে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

শুক্রবারেই চিঠি এল রাজেন্দ্র শনিবারে আসছে। সোমবারে কি একটা ছুটি। সেই জন্যেই আসছে।

চিঠিখানা পেয়ে পর্যন্ত সূর্যমুখী ভয়ে অস্থির। হাত তার খালি। এখন মাসের শেষের দিক। সুতরাং রাজেন্দ্রও যে সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ আনতে পারবে, তার সম্ভাবনা কম।

মাসের শেষের দিকে সূর্যমুখীর এই রকম বরাবর হয়। এই সংসারে পল্লীগ্রামে যে টাকার প্রয়োজন, রাজেন্দ্র বলে তার চেয়ে অনেক বেশি সে দিচ্ছে। তা যদি সত্য হয়, তাহলে দোষ সূর্যমুখীরই নিশ্চয়। তার গৃহিনীপনায় ত্রুটি আছে কোথাও। নইলে প্রতি মাসেই শেষের দিকে এমন টান পড়ে কেন?

রাজেন্দ্র কড়া-কড়া কথা বলে, তুমি না হয় বড় লোকের মেয়ে। তোমাদের সংসারে খরচের হিসেব রাখার দরকার হয় না। কিন্তু আমি তো বড় লোক নই। দেড়শো টাকার কেরাণী। ও সব বড়মান্ষী আমার সংসারে চলবে না। সাফ বলে দিলাম।

সূর্যমুখী চুপ করে থাকে! দোষস্থালনের চেষ্টামাত্র করে না। হেসে বলে, আচ্ছা, খুব হয়েছে। আর ছেলেমেয়েদের সামনে বকতে হবে না। আসছে মাস থেকে দেখ, আমি কি রকম সংসার চালাই।

রাজেন্দ্র বললে, দশ বছর দেখে আসছি। আসছে মাসে কি হবে তাও আমি জানি। আমি গরীব মানুষ, টাকার লোভে বড় লোকের বাড়ি বিয়ে করতে যাওয়াই ভুল হয়েছিল!

কথাটা সত্যি। টাকার লোভেই, যদিচ সে নিজে নয়, তার বাপ-মা হাসপুকুরের বাবুদের বাড়ি থেকে বউ এনেছিলেন। এক গা গহণা এবং অত্যন্ত মিষ্টি একখানা মুখ ছাড়া সূর্যমুখীর বিবাহ-নদী পার হবার কোনো পাথেয় ছিল না। না রং, না বিদ্যা। মেয়ের রূপের অভাব ছিল বলেই হাসপুকুরের বাবুরা দরিদ্র ঘরে মেয়ের বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিশেষ, রাজেন্দ্র অপূর্ব সুশ্রী, স্বাস্থ্যবান যুবক এবং তখন এম, এ, আর আইন পড়ছিল। তার ধনী শ্বশুরের ইচ্ছা ছিল, আইনটা পাস করলেই তাকে একবার বিলাত ঘুরিয়ে ব্যারিষ্টার করে নিয়ে আসবেন। তাহলেই দরিদ্র-গৃহে কন্যা সম্প্রদানের দুঃখ আর থাকবে না।

কিন্তু রাজেন্দ্রের কি যে হল, শ্বশুর যতদিন জীবিত ছিলেন, তার মধ্যে সে এম, এ, কিংবা আইন পাস করতেই পারলে না। এবং শ্বশুরের অব্যবহিত পরে, বিলাত যাওয়ার আশা যখন সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেল, তখন অল্প বেতনে একটা চাকরী নিয়ে বসল।

ভালোই করেছিল। নইলে দেখতে দেখতে চাকরীর বাজারে যেমন মহার্ঘ হয়ে উঠল তাতে তার পক্ষে চাকরী জোটানই দুরুহ হত।

কিন্তু চাকরী তার যত নম্রই হোক, মেজাজটা একেবারেই নম্র নয়। বোধ করি ওই যে তার শ্বশুর তাকে একদিন বিলাত পাঠাবার আশা পোষণ করেছিলেন, আশা ফলবতী না হলেও বিলিতি মেজাজটা তার স্বভাবের মধ্যে এসে গিয়েছিল যদিও সে মেজাজটা সূর্যমুখীর কাছে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশের পক্ষে নিরাপদ ছিল না।

সূর্যমুখী নির্বিচারে সমস্ত কটুক্তি সহ্য করত। সে শান্ত, নম্র, নিতান্ত গোবেচারী ভালো মানুষ। কিন্তু শুধু সেই জন্যেই সহ্য করত না। আসল কথা, অপূর্ব রূপবান এই স্বামীকে পেয়ে তার নিজের মন নিজের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ স্বামীর

তিরস্কারে সে কখনও মুখ বুঁজে থাকত, কখনও বা কাঁদত, কিন্তু কিছুতেই রাগ করতে পারত না।

এ একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি ঃ ভয় এবং আনন্দ।

টুলু বললে, বাবা আমার জামা আনবেন তো?

—কি জানি মা। হাতে টাকা থাকলে আনবেন। নইলে কি করে আনবেন বল?

টুলু পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল ঃ তা আমি জানি না। বাবা বলেছিলেন কেন আনবেন না? না আনলে আমি কেঁদে কেটে রসাতল করব।

সূর্যমুখী তাড়াতাড়ি ওকে সামলাতে বসল, ছি মা! তুমি বড় হচ্ছ অমন অবুঝের মতো আবদার করে কখনও! আনেন ভালো, না আনলে মোটে কান্নাকাটি করবে না। কেমন?

টুলুকে চুপ করিয়ে সূর্যমুখী পাশের বাড়ি গেল। ও বাড়ির ছোট বৌ রমা তার সমবয়সী, বন্ধু।

তাকে বললে, গোটা দুই টাকা দিবি রমা? মাস কাবারে দোব।

রমা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে? নাগর আসবে বুঝি?

হাসি-হাসি মুখে, ভীরু-ভীরু চোখে সূর্যমুখী বললে, হ্যাঁ।—

—তার জন্যে টাকা কি হবে রে?

খাওয়াদাওয়ায় টাকা খরচ আছে না? হাতে একটি পয়সা নেই।

—নাই থাকল। তিনি নিজেই তো আসছেন। তিনি দেবেন না?

একটা ঢোঁক গিলে সূর্যমুখী বললে, দেবেন হয় তো। কিন্তু এর এর মধ্যে টাকা ফুরিয়েছে শুনলে ভীষণ বকাবকি করবেন। দোষ তো আমারই। আমি হিসেব করে চলতে পারি না।

রমা রেগে গেল : দেখ্ সূর্যমুখী, অত ভালোমানুষীও ভালো নয়। কত টাকা দেয় শুনি তোর স্বামী? আশী টাকায় মাস চলে? তুই যা হিসেব করে চলিস, অমন করে আমরা কেউ চলতে পারি না। নিজের পেটে না হয় দড়ি বাঁধলাম, ছেলে-মেয়ের পেটে তো দড়ি বাঁধতে পারি না।

সূর্যমুখী কান পেতে কথাগুলো শুনলে। রমার প্রত্যেকটি কথা সত্যি। বাস্তবিক, ও যা হিসেব করে চলে তার চেয়ে বেশি হিসেব করে চলা যায় না। সত্যি, এত ভালোমানুষী ভালো নয়।

শক্ত হয়ে বললে, এবারে কথা বলতে এলে শোনাব।

—হ্যাঁ, শোনাবি। অত খাতির কিসের?

সূর্যমুখীও রেগে উঠল : না আর খাতির করব না। খাতির করে করে মাথায় তুলেছি। মুখের বাক্যি তো শুনিস নি, মরা মানুষও রেগে উঠে বসে।

রমা হেসে বললে, তবু তুই রাগিস না। কি যে চাঁদমুখ দেখেছিস!

শুনে সূর্যমুখীও হেসে ফেললে। কিন্তু তখনই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, রাগি না! রাগে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। চুপ করে থাকি, কথা বাড়াই না, শুধু এই ভেবে যে ছেলেমেয়ের সামনে একটা কেলেঙ্কারী হবে। তাহলে গেলবারের কথাটা শোন্ বলি।

সূর্যমুখী ওদের দাওয়ায় ভালো করে বসে বলতে লাগল :

মানুষটা কতদিন পরে বাড়ি আসে, মেসে থাকে, সেখানে কী-ই বা খেতে পায়! আমি ছেলে-মেয়েদের জন্যেও রোজ মাছ কিনি না। পাব কোথা বল্! সেদিন বাগ্দীবৌ একটা ভালো মাছ নিয়ে এল, ওর কথা ভেবেই মাছটা কিনে ফেললাম। রাত্রে চোব্ব-চোষ্য চেঁটে পুটে তো খেলেন। পরের দিন মাগী এসেছে মাছের দামটা নিতে। ওর গলা তো জানিস, যেন কাঁসর বাজছে। যত বলি আজ যা, কাল এসে নিবি। ও কি শোনে! যত বলি তত ওর গলায় কাঁসর বাজে। ঠিক ওর কানে গেছে। টক্ টক্ করে নেমে এসে জিগ্যেস করলে, কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

ওকে দেখে বাগদী-বৌ তো জড়সড় হয়ে গেছে। আমি যত বলি, ও কিছু নয়, তুমি শোও গে। কে কার কথা শোনে!

ওপর থেকে শুনেছে সবই। সেই বাগ্দী-বৌএর সামনে আমাকে হাড়ির অপমান।

শুনে রমা খুব দুঃখ পেল।

ভিতর থেকে দুটো টাকা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, আর কিনবি নে কক্ষণো।

—আবার! দিব্যি করেছি। এবারে কচু দিয়ে বড়ির ঝোল আর ভাত। বলব, আমরাও বারো মাস এই খাই, তুমিও খাও। দেখ কি রকম হিসেব করে চলেছি।

—হ্যাঁ। তাই করবি।

শনিবার দুপুর বেলায় বাগদী-বৌএর ডাক শোনা গেল—মাছ নেবে নাকি গো!

সূর্যমুখী তখন রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত ছিল। সেইখান থেকেই সাড়া দিলে, না গো।

—ভালো মাছ আছে বৌদি।

মাছ যে আজ সে নেবে না, রাজেন্দ্রকে কচুর ঝোল খাইয়ে বুঝিয়ে দেবে সে হিসেব করে চলতে শিখেছে এবং যে-টাকা রাজেন্দ্র দেয় তাতে এর বেশি হয় না, সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেও ভালো মাছের নাম শুনে নিছক কৌতূহল এবং অভ্যাসের বলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

চেয়ে দেখলে, মাছটা সত্যই ভালো। একটা প্রকাণ্ড পাকা মাগুর মাছ। এত বড় মাগুর মাছ বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু মাছ যত ভালোই হোক, সে নেবে না। এ সংকল্প থেকে কেউ তাকে নড়াতে পারে না।

বললে, না বাছা! মাছ নোব না।

বাগ্দী-বৌ হেসে বললে, দাদাবাবু আজ আসবে না বুঝি?

ওর দুর্বলতার সংবাদ বাগদী-বৌও রাখে।

সূর্যমুখী হেসে বললে, না, আসবে না। তুই যা!

টুলু ওঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, না, আসবেন গো। মা মিছে কথা বলছে।

চোখ ঘুরিয়ে বাগদী-বৌ বললে, তবে যে বললে আসবে না? চলে যেতে বললে আমাকে—হু! চালাকী হচ্ছে?

—চালাকী আবার কি!—সূর্যমুখী রেগে বললে,—তোর কাছে মাছ নোব কি? তুই তো কালকেই কাঁসর বাজাতে বাজাতে চলে আসবি?

—ওঃ! সেই কথা! তা বেশ, কাল আসব না, পরশু আসব না, দাদাবাবু যে কদিন থাকবে, আসব না। হল?

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে সূর্যমুখী দাঁড়িয়ে রইল।

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ কি! এই মাছ রইল, আমি চললাম।

বলে চোখে একটা কটাক্ষ হেনে বাগদী-বৌ দুম দুম করে চলে গেল।

রান্নাঘরের খুটিতে ঠেস দিয়ে তখনও সূর্যমুখী দাঁড়িয়ে, এমন সময় রমা এল।

তাকে দেখেই সূর্যমুখী বলে উঠল: দেখ্ দেখি ভাই, বাগদী-বৌএর কাণ্ড! বললাম, মাছ নোব না তবু মাছটা ফেলে দিয়ে পালাল!

রমা হেসে ফেললে। বললে, ও তো জানে, কর্তা আসবে, মাছ তুই নিবিই। তাই অমন করে পালাল। ও তো চেনে তোকে!

লজ্জিত ভাবে সূর্যমুখী বলতে গেল, না সত্যি,—

বাধা দিয়ে রমা বললে, না মিথ্যে! তোকে ও যেমন চেনে, আমিও তেমনি চিনি। সবাই চেনে।

—কি চিনিস?

—যে কর্তা যেদিন আসবে, সেদিন আর তোর কাণ্ডজ্ঞান থাকবে

না। নইলে আমিই বা তোকে টাকা দুটো দিতে যাব কেন বল? কর্তাকে ভালো-মন্দ দুটো খাওয়াবি বলেই তো!

সূর্যমুখী রেগে গেল: দেখ্ রমা, বাজে বকিস না।

—আচ্ছা, আর বকব না। শুধু একটা কথা বলি, অত নরম হস্‌নে। তাহলে পুরুষ মানুষে পেয়ে বসে। খাওয়াবি না কেন, খাওয়াবি। কিন্তু বকুনি সহ্য করবি নে। এক কথা বললে দশ কথা শুনিয়ে দিবি। দেখবি, জব্দ থাকবে।

সন্ধ্যার লোকালে রাজেন্দ্র এলো।

টুলু বাবা আসবেন বলে রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। রান্নাঘর থেকেই সূর্যমুখী ওদের দু'জনের কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতর প্রবেশ টের পেল। কিন্তু তখনই সে বেরিয়ে আসতে পারলে না। তার বুকের ভিতরটা কি রকম গুর্ গুর্ করছিল, ভয়ে এবং আনন্দে। কে জানে, রাজেন্দ্রের মেজাজটা কি রকম! কে জানে, দেখা হওয়ামাত্র বকুনি খাবে কি না!

রান্নাঘরের দরজার আড়াল থেকেই উঁকি দিয়ে রাজেন্দ্রের মুখভাবটা একবার সে পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করলে কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না।

রাস্তা থেকে ওদের পিতাপুত্রী দুজনেরই আনন্দিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। বাড়ির ভিতরে আসতেই এখন শুধু একজনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, টুলুর।

বারান্দায় একখানা ডেক-চেয়ার রাজেন্দ্রের জন্যে সূর্যমুখী আগে থেকেই পেতে রেখেছিল। সামনে জলপূর্ণ গাড়ু ও গামছা। রাজেন্দ্র গায়ের জামা খুলে ফেলে ডেক-চেয়ারে বিশ্রাম করছিল।

সূর্যমুখীর মাথায় পূর্বসংকল্পের চিহ্নমাত্র নেই। রমা যে সমস্ত মূল্যবান উপদেশ দিয়ে গিয়েছিল তাও কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। মাথার মধ্যে এখন দুটি বস্তু আছে—ভয় ও আনন্দ। রাজেন্দ্রকে দেখে ওর আনন্দ হয়েছে। যখনই দেখে, তখনই আনন্দে সে

অভিভূত হয়ে যায়। এখনও সেই অবস্থা। তার সঙ্গে ভয়। কে জানে, ওর মেজাজ কেমন আছে। কে জানে দেখামাত্র কি কড়া-কথা বলে বসে। শুধু এই তুটি বস্তু। মান নয়, অশ্রু নয়, ক্রোধ নয়, হাসিও নয়।

ধীরে ধীরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সূর্যমুখী এ-বারান্দায় এল। রাজেন্দ্র তার দিকে একবার চেয়েই অন্যমনস্ক হয়ে গেল। একটা কুশল-প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলে না।

আরও একটুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যমুখী জিজ্ঞাসা করলে, শরীর ভালো ছিল তো?

—হুঁ।

—তোমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। ট্রেন কি লেট ছিল?

রাজেন্দ্র এই অনাবশ্যক প্রশ্নের আর উত্তর দিলে না। ট্রেণ দেরি ছিল না। এই ট্রেণটা দেরি বড় করে না। করলেও তু'পাঁচ মিনিট। বিনা-ঘড়িতে রান্নাঘরের মধ্যে থেকে সেটা সূর্যমুখীর পক্ষে কেন, কারও পক্ষেই বোধগম্য হবার কথা নয়।

এটা সূর্যমুখীর মামুলী প্রশ্ন। তার কেমন মনে হয়, রাজেন্দ্রের আরও আগে আসা উচিত ছিল। ট্রেনটা অসম্ভব দেরি করেছে, অসম্ভব দেরি। বিনা-ঘড়িতে রান্নাঘরে বসে রাজেন্দ্রের জন্যে প্রতীক্ষা করতে করতে বরাবরই এই কথা তার মনে হয়। রাজেন্দ্র প্রতিবারই এই একই প্রশ্ন শোনে। কোনোবার জবাব দেয়, কোনোবার দেয় না।

সে ডেক-চেয়ার থেকে উঠে হাত-মুখ ধুতে বসল। সূর্যমুখী ব্যস্তভাবে রান্নাঘরে চলে গেল। রাজেন্দ্র চিঁড়েভাজা বড় ভালবাসে। সূর্যমুখী চায়ের জল চড়িয়ে এসেছে। সেটা নামিয়েই চিঁড়ে ভেজে নেবে।

হাতমুখ ধুয়ে রাজেন্দ্র সুস্থভাবে ডেক-চেয়ারে বসতেই রান্নাঘর থেকে সূর্যমুখী বললে, টুলু, একখানা টুল রাখ ওখানে।

টুলু তাড়াতাড়ি একখানা টুল এনে বাবার ডেক-চেয়ারের পাশে রাখলে। একটা বাটিতে করে চিঁড়ে-ভাজা এবং এক পেয়ালা চা নিয়ে এল সূর্যমুখী।

রাজেন্দ্র গম্ভীরভাবে জলযোগে মনোযোগ দিলে।

আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যমুখী জিজ্ঞাসা করলে, চা খেয়ে কি বেরুবে নাকি?

—হ্যাঁ, কেন?

অর্থাৎ সেকথা জিজ্ঞাসা করছ কেন? তোমার কিছু দরকার আছে? বেরুতে গেলে কি তোমার অনুমতি নিতে হবে?

ভয়ে সূর্যমুখী জড়সড় হয়ে গেল। থতমত খেয়ে বললে, তোমার ফিরতে দেরি থাকলে ভাত দেরি করে চড়াব। শীতের রাত্রি, বড় তাড়াতাড়ি ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

রাজেন্দ্র কোনো জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেল।

সূর্যমুখী মহা মুস্কিলে পড়ল।

তার অন্যান্য রান্না যখন হয়ে গেল, তখন ভাত চড়াবে কি আর একটু দেরি করবে ভেবে স্থির করতে পারলে না। যদি এখনই চড়ায় এবং রাজেন্দ্রর তাস খেলে ফিরতে দেরি হয়, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা ভাত রাজেন্দ্র মোটে পছন্দ করে না। ভাতের থালা ঠেলে রেখে, উপরে শুতে চলে যাবে। আর যদি তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এবং তখনও ভাত না হয়, তাহলে তো কুরুক্ষেত্র বাধাবে। অথচ বলেও গেল না, বলে যাওয়ার দরকারই বোধ করলে না, তার ফিরতে দেরি হবে কি হবে না।

সূর্যমুখী অনেকক্ষণ চিন্তা করলে। ওদের তাসের আড্ডা যেদিন জোর বসে, সেদিন ওর ফিরতে বারোটা হয়ে যায়। কোনো কোনো দিন তারও বেশী। সকাল-সকাল সে কোনাদিন ফেরে না তা নয়। কিন্তু সেটা কমই ঘটে। হয়তো খেলবার লোক জুটল না, কি কারও শরীর খারাপ, এই রকম ক্ষেত্রে।

ভেবে-চিন্তে সূর্যমুখী টুলুকে ঘুম পাড়াতে গেল। তাকে ঘুম পাড়িয়ে যখন ফিরে এল তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর পাড়াগাঁয়ে একটু রাত্রি হলে, ঘড়ি না থাকলে বোঝাবারই উপায় থাকে না, রাত্রি কত—আটটা কি বারোটা।

সূর্যমুখীও ঠিক করতে পারলে না, রাত্রি কত। কিন্তু মনে হল, রাত্রি হয়েছে, এখন রান্না চড়ালেই ঠিক হবে।

সূর্যমুখী রান্না চড়ালে।

একটু পরেই রাজেন্দ্র ফিরল চটি ফট্ ফট্ করতে করতে। তখনও ভাত ফোটেনি। ভয়ে সূর্যমুখীর রক্ত হিম হয়ে গেল।

বেরিয়ে এসে হাসি-হাসি মুখে বললে, একটু বোস। আমার ভাত হয়ে এসেছে।

—হয়ে এসেছে মানে? হয়নি এখনও? কি করছিলে? ঘুমুচ্ছিলে?

বিনীত কণ্ঠে সূর্যমুখী বললে, ভেবেছিলাম, তোমার ফিরতে দেরি হবে।

—কেন ভেবেছিলে? আমি বলে গিয়েছিলাম, দেরি হবে?

—আমি জিগ্যেস করলাম, তুমি কিছুই বলে গেলে না।

—তার মানে কি দেরি হবে?

—গেলবারে তো খুবই দেরি হয়েছিল। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তুমি খেতে পারনি।

—অতএব এবারও দেরি হবে! কী বুদ্ধি!

করুণ মিনতির সঙ্গে সূর্যমুখী বললে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি রাগ কোর না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করা এমন কিছুই নয়। কিন্তু রাজেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ওই যে সূর্যমুখী মিনতি করে বললে, রাগ কোর না,—আর রাজেন্দ্রের পক্ষে ক্রোধ সংবরণ করা কঠিন্ হয়ে উঠল। সে রাগ করবেই। সে রাগ করল।

বললে, বসে বসে ভাত রাঁধ তুমি। কাল সকালে খাব ও ভাত। এখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

বলে দুম দুম করে শুতে চলে গেল।

সূর্যমুখী কাঠের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। দেহে রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল। নিজের বুকের গুরু গুরু ধ্বনি যেন সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে।

একটু পরে ছুটল রান্নাঘরে।

ভাত সবে ফুটতে আরম্ভ করেছে। এবারে কয়লা-ওলা কি যে কয়লা দিয়ে গেছে, আঁচ হয় না ভালো। বেছে বেছে এবারেই সে ওই রকম কয়লা দিয়েছে। কয়েকখানা কাঠ দিলে উনানে। হাতা দিয়ে ভাতটা জোরে জোরে নাড়তে লাগল, যেন ঠেঙিয়েই সিদ্ধ করে ফেলবে।

আজ রাত্রে কি দুঃখ যে অদৃষ্টে আছে ভাবতেই তার বুকের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছে। শতবার নিজেকে সে ধিক্কার দিলে। সত্যই তো, আড্ডায় না গেলে রাজেন্দ্র কি করে বুঝবে, তার ফিরতে দেরি হবে কি না? তারই উচিত ছিল, ভাত রেঁধে উনানে বসিয়ে রেখে দেওয়া। গেলবারে তাই করেছিল যদিও, সেবারে রাজেন্দ্রের ফিরতে এত দেরি হয়েছিল যে, তাতেও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেবারেও অত দেরি হয়েছিল বলে এবারেও তাই হবে, এমন মনে করবার কি কারণ ছিল?

সত্যই সে নির্বোধ। বয়স তো কম হল না, এখনও যদি বুদ্ধি না হয়, আর কবে হবে? বরং বোকা মেয়ের বুদ্ধি না খেলাতে যাওয়াই ভালো। বুদ্ধি করতে গেলেই বিপদ ঘটে। সূর্যমুখী বারে বারে নিজেকে এবং নিজের বুদ্ধিহীনতাকে ধিক্কার দিতে লাগল।

পাঁচ মিনিট নয়, পোনের মিনিট পরে ভাত নামল। সূর্যমুখী ধীরে ধীরে উপরে গেল। মুখ শুকিয়ে গেছে। বুক কাঁপছে। পা যেন চলছে না। তবু যেতে হল।

ঘরের এক কোণে হারিকেন টিম টিম করে জ্বলছে। খাটের এক প্রান্তে টুলু, অন্য প্রান্তে রাজেন্দ্র। তার নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। কিন্তু সূর্যমুখীর সন্দেহ হচ্ছে, রাজেন্দ্র ঘুমোয়নি। এর মধ্যে সে ঘুমোতে পারে না। এত শীঘ্র সে ঘুমুতে পারে না।

আস্তে আস্তে ওর পায়ের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে একটি হাত ওর পায়ের উপর রাখলে।

—শুনছ?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

—শুনছ? ওঠ। রান্না হয়েছে।

তথাপি নীরব।

—রাগ কোর না। আমার অপরাধ হয়েছে। আর কখনও এমন হবে না। শুনছ? ওঠ।

এবারে রাজেন্দ্র গর্জন করে উঠল: কি জ্বালাতন করছ!

ধমক খেয়ে সূর্যমুখী চমকে উঠল।

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ধীরে ধীরে বললে, শুনছ! রাত বেশি হয়নি। ওঠ। আমাকে আর কষ্ট দিও না। এইবারটি ক্ষমা কর,—এই শেষ বার। আর কখনও এমন হবে না। দেখো তুমি।

রাজেন্দ্র আর সহ্য করতে পারলে না। তড়াক করে খাট থেকে নেমে ওর একখানা হাত চেপে ধরলে। হিড় হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে এল। তারপর তাকে সেই খানে রেখে ঘরে এসে দোর বন্ধ করে দিলে।

সূর্যমুখী প্রথমটায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল, কখনও যা রাজেন্দ্র করেনি, রাগের মাথায় বুঝি তাই করে বসে। তার গায়ে হাত তোলে। একবার সে মনে মনে মৃত্যুকে ডাকলে। তার পরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

ভোরে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নির্বিকার চিত্তে রাজেন্দ্র নিচের বারান্দায় তার সেই ডেক-চেয়ারটিতে এসে বসল।

তখনই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সূর্যমুখী। তার এক হাতে চায়ের প্লেট, অন্য হাতে একখানা থালায় এক রাশ লুচি, আলুর দম এবং আরও কি কি যেন। তার চোখ ছলছল, অন্য চোখে নম্র একটুকরো হাসি।

কিন্তু রাজেন্দ্র তার দিকে চাইলই না।

চন্দ্রমুখী

স্ত্রী বিয়োগের পর ব্রজেন্দ্রের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্র এমনই প্রতিকূল হয়ে দাঁড়াল যে, না করে উপায় রইল না। প্রথম পক্ষের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে রয়েছে। তারা এত বড় হয়নি যে, নিজেরাই নিজেদের দেখা-শোনা করতে পারে। ব্রজেন্দ্রের এমন কোনো আত্মীয়া নেই—যাকে এই জন্যে সে নিজের বাড়ি নিয়ে আসতে পারে। একটি দূর সম্পর্কীয়া পিসি আছেন, তিনি নিঃসন্তান এবং নিঃসম্বল। কিন্তু ব্রজেন্দ্রের রুক্ষ মেজাজের সঙ্গে পরিচয় থাকায় তিনি এত বড় সুযোগ গ্রহণ করতেও স্বীকৃত হলেন না। অন্য দিকে ব্রজেন্দ্রেরও এমন সঙ্গতি নেই যে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতায় বাসা করেন।

ফলে ব্রজেন্দ্রের রুক্ষ মেজাজ রুক্ষতর হল। তাকে এমন বিপদে ফেলে পরলোকগমন করায় স্ত্রীর উপর চটল, পিসি না আসায় তাঁর উপর চটল, এমন কি বড় মেয়ে টুলু সংসার চালাবার উপযুক্ত আরও খানিকটা বড় না হওয়ার জন্যে তারও উপর চটল।

এবং এই রকম ক্রুদ্ধ অবস্থাতেই একদিন চন্দ্রমুখীর চন্দ্রমুখ দেখে তার পছন্দ হয়ে গেল এবং মাস কয়েক পরেই তাকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এল।

চন্দ্রমুখী দরিদ্র পিতার পঞ্চম কন্যা। রূপ ছাড়া আর কোনো সম্বল তার ছিল না। ব্রজেন্দ্র তার চন্দ্রমুখ দেখে বিজিত হয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা ছিল না, ওই মুখের অভ্যন্তরে যে রসনা আছে, সেটি ললিত নৃত্যপরায়ণা।

যখন জানতে পারলে তখন আর বিবাহ ফেরৎ দেওয়ার উপায় ছিল না। এবং উপায় যদি থাকত, তাহলেও সম্ভবত ব্রজেন্দ্র ফেরৎ

দিতে সম্মত হত না। কারণ 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। চন্দ্রমুখীকে তার ভালো লেগে গেছে। সুন্দর মুখ ছাড়াও তার আর একটি কারণ এই যে, বিবাহের কয়েকটা দিন পরেই অফিসে তার পদবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কতকগুলো টাকা বেতন বৃদ্ধিও হয়ে গেল। ব্রজেন্দ্রের দৃঢ় ধারণা, এটা চন্দ্রমুখীর জন্যেই হয়েছে।

চন্দ্রমুখী শহরের মেয়ে। শাড়িতে-ব্লাউসে, স্নোতে-পাউডারে সম্পূর্ণ শহুরে। কি রঙের শাড়ির সঙ্গে কি রঙের ব্লাউস মানায়, কোন্ স্নো'টা সম্প্রতি বাজে হয়ে গেছে আর কোন্টা এখন চলছে বেশি ইত্যাদি ব্যাপারে গ্রামের মেয়েরা তার কাছে শিক্ষা নিতে আসে।

ব্রজেন্দ্রের সাধ্য নেই কলকাতায় বাসা করে। বেতন-বৃদ্ধির পরেও না। আর চন্দ্রমুখী গ্রামে এসে তার সুন্দর নাকটিকে সকল সময়ই কুঁচকে রাখতে লাগল।

বাড়িতে নলকূপ নেই, একটা ইন্দারা পর্যন্ত না। অনাবৃত পুকুর-ঘাটে গিয়ে স্নান করার নামে চন্দ্রমুখী শিউরে উঠল। সব চেয়ে বিপদ হ'ল রাত্রে। অন্ধকার রাত্রি। চারিদকে জঙ্গল। বাড়ির পিছনে শেয়াল ডাকছে, হুতোম পেঁচা।

শনিবার ব্রজেন্দ্র বাড়ি আসতেই চন্দ্রমুখী কেঁদে ভাসিয়ে দিলে—এখানে সে আর একটা দিনও থাকতে পারবে না। রবিবার রাত্রে ব্রজেন্দ্র যখন কলকাতা ফিরবে, তখন তার সঙ্গে চন্দ্রমুখীও যাবে। কোনো কথা শুনবে না। এখানে থাকলে সে মরে যাবে।

ব্রজেন্দ্র আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেল। বললে, কি পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকছ।

—পাগলের মতোই বটে। তবু এখনও পাগল হইনি। আর কিছুদিন থাকতে হলে পাগল হয়ে যাব।

ব্রজেন্দ্রের মেজাজ উগ্র বলে প্রসিদ্ধ। কিন্তু কান্নাকাটিতে সেও খানিকটা ভড়কে গেল। চেষ্টা করে একবার মেজাজটা গরম

করলে। কিন্তু চন্দ্রমুখী তাতে ভয় পাবার মেয়ে নয়। আরও জোরে জোরে কাঁদতে লাগল।

আর বলতে লাগল—আমি কিছুতেই এখানে থাকব না। তুমি না নিয়ে গেলে আমি আত্মহত্যা করব।

এবারে ব্রজেন্দ্র ভড়কে গেল সত্যই। সে শান্তভাবে চন্দ্রমুখীকে বোঝাতে বসল, পুকুরে স্নান করার মধ্যে বে-আব্রুতা মোটেই নেই। সকলেই এখানে তাই করে; এটা পাড়া গাঁ, প্রতিবেশীরা এখানে আত্মীয়ের মতো। তা ছাড়া, ব্রজেন্দ্র ঠিক করেছে যে, আগামী মাসে অফিসের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু ঋণ নিয়ে বাড়িতেই একটা টিউব-ওয়েল বসাবে।

—আর শেয়ালগুলো? তাদের ডাক তুমি থামাবে কি করে?—অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চন্দ্রমুখী বললে।

এবারে ব্রজেন্দ্র হেসে ফেললে। বললে শেয়াল কি মানুষকে কামড়ায়? শেয়ালকে ভয় কিসের? তাছাড়া তুমি তো দোর-বন্ধ করে শুয়ে থাক।

কিন্তু দোর বন্ধ করে থাকলেও ওই হুতোম-থুমোর ডাকে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

চন্দ্রমুখীর অশ্রু-ধারা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সিক্ততা যায়নি একেবারে।

ব্রজেন্দ্র সাহস দিলে, ওতে আবার ভয়টা কি? ওটা কি জান তো?

কি?

—পেঁচা। মা-লক্ষ্মীর বাহন!

ব্রজেন্দ্রের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চন্দ্রমুখী বললে, তা হোক বাপু। ডাক শুনলে ভয় করে।

—ওটা পেঁচার ডাক, তা জানার পরেও ভয় করে?

—এই তো জানলাম। দেখব ভয় করে কি না।—চন্দ্রমুখী হেসে বললে।

ওর হাসি দেখে ব্রজেন্দ্র খানিকটা ভরসা পেলে। পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে, টর্চটা হাতে করে সে তাসের আড্ডায় যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

চন্দ্রমুখী সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় চললে?

—একটু বেড়িয়ে আসি।

—তাসের আড্ডায় তো?

—হ্যাঁ। দেরি হবে না।

—ওরে বাবা!—চন্দ্রমুখী ভয়ে কুঁকড়ে গেল,—আমি ওপরে চললাম। তুমি ফিরে এলে রান্না চড়বে।

ব্রজেন্দ্র সবিস্ময়ে বললে, সে আবার কি এখন সবে সন্ধ্যে। চারিদিকে লোকে গল্প করছে। এর মধ্যে এত ভয় কিসের?

চন্দ্রমুখীও বিরক্ত কণ্ঠে বললে, তা বাপু, আমার যদি ভয় করে, আমি করব কি?

—অন্য দিন কি কর?

—কি আবার করব? সন্ধ্যেবেলাতেই ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে দিই। নিজেও দুটো খেয়ে নিই। তারপরে রান্না ঘরে তালা বন্ধ করে, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

—এই সন্ধ্যে বেলাতেই?

—হ্যাঁ।

—প্রত্যহ?

—যেদিন পাড়ার মেয়েরা গল্প করতে আসে সেদিন শুধু নিচে থাকি। তা তারা তো রোজ আসে না।

পাঞ্জাবীটা খুলে ফেলে ব্রজেন্দ্র বললে, ঠিক আছে। আমি এই ডেক-চেয়ারে বসে রইলাম। তুমি নির্ভয়ে রান্না কর গে।

সন্দিগ্ধ চিত্তে চন্দ্রমুখী বললে, ঠিক তো? না আমিও রান্নাঘরে যাব, আর তুমিও তাসের আড্ডায় পালাবে?

—না, না। পালাব না। তুমি মাঝে মাঝে দেখে যেও।

রান্না ঘরে যেতে যেতে চন্দ্রমুখী বললে, তাই যাব। তুমি পালালেই আমিও ওপরে গিয়ে খিল বন্ধ করব! তখন মজা টের পাবে!

বলে এমন করে একটা কোপ-কটাক্ষ হেনে গেল যে, ব্রজেন্দ্র আড়ষ্টভাবে সেই ডেক-চেয়ারে শুয়ে রইল। পালিয়ে যাবার চিন্তা পর্যন্ত করতে সাহস করলে না।

ওদের তাসের আড্ডায় যারা বন্ধু-বান্ধব, তাদের কয়েকজন ব্রজেন্দ্রের মতোই কলকাতায় চাকরী করে এবং তাদের সঙ্গে একই ট্রেণেই এসেছে। ব্রজেন্দ্র আড্ডায় না আসায় তারা চিন্তিত হল ওর স্বাস্থ্যের কথা ভেবে।

সকালেই এল হৃষীকেশ।

—কি হে, কাল গেলে না তো!

—শরীরটা ভালো ছিল না ভাই। মাথায় এমন যন্ত্রণা আরম্ভ হল—

ব্রজেন্দ্র নিজের মাথাটা টিপে ধরল।

হৃষীকেশ গম্ভীরভাবে বললে, আমরাও সেই রকম সন্দেহ করেছিলাম। ঠাণ্ডায় ওরকম হয়েছে।

—তাই হবে। —ব্রজেন্দ্র শুষ্ক মুখে বললে।

হৃষীকেশ বাড়ি ফিরতেই তার স্ত্রী রমা বললে, তোমার বন্ধুর কাণ্ড শুনেছ?

—কোন্ বন্ধুর?

—আবার কোন্ বন্ধুর! ব্রজেন বাবুর।

—বেচারার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে।

রমা হাসতে হাসতে বললে, যন্ত্রণার এই তো সবে আরম্ভ!

এখনও অনেক যন্ত্রণা হবে। যা কষ্ট সে-বৌটাকে দিয়েছে, সব মনে আছে।

হৃষীকেশ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল তো?

—শক্তের পাল্লায় পড়েছেন এবার!

—তার মানে?

—তার মানে, দ্বিতীয় পক্ষ কাল বেরুতে দেননি! মাগো, কী ঘেন্নার কথা! রমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

—সে আবার কি!

—হ্যাঁ। ঘাটে চন্দ্রমুখীর সঙ্গে দেখা। সে নিজেই বললে।

—কি বললেন?

—বললে, জামা গায়ে দিয়ে আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিলেন। বললাম, যাচ্ছ যাও, রান্না কিন্তু তুমি ফিরে এলে চড়বে। আমি সন্ধ্যাবেলায় একা নিচে থাকতে পারব না। ভদ্রলোক জামা খুলে চুপ করে বসলেন, আর বাইরে গেলেন না।

—ওর বৌএর খুব ভয় বুঝি?

ঠোঁট উল্‌টে রমা বললে, ভয় না হাতী! শহুরে চাল, বুঝলে না? কিন্তু এর দরকার ছিল। সে বৌটাকে নাস্তানাবুদ করে মেরেছে। ঠাকুরকে ডাকতাম, ও যেন বিয়ে করে আর এবারে যেন একটা দজ্জাল বৌএর হাতে পড়ে। ঠাকুর শুনেছেন কথা। যেমনি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনি মেয়ের হাতে পড়েছে!

রমার মুখখানা খুশিতে ভরে গেল।

তারপর বললে, এখানকার বাস তুলে ওরা সব কলকাতায় চল্‌ল যে!

—সে কি!

—হ্যাঁ। চন্দ্রমুখী এখানে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এখানে পুকুর-ঘাটে স্নান করতে হয়, আব্রু থাকে না।

তারপর রাত্রে শেয়াল ডাকে, পেঁচা ডাকে। ওর একলা থাকতে ভয় করে। বলছিল, পাড়া গাঁ এমন জায়গা জানলে, ওর বাবা কখনই এখানে বিয়ে দিতেন না।

হৃষীকেশ রেগে বললে, না। লাট সাহেবের বাড়ি মেয়ের বিয়ে দিত। দ্বিতীয় পক্ষ বলেই ব্রজেনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। নইলে এবাড়িতেও ওর পড়বার কথা নয়।

—কিন্তু ও তো বলে—

—কি বলে? বাড়িতে তিনখানা মোটর আছে? দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না, জান?

এত গরীব?

—হ্যাঁ। একখানা এঁদো বাড়ির একতলায় একখানা ঘর নিয়ে অতগুলি প্রাণী থাকে। আমি দেখিনি?

—তাই বুঝি! কিন্তু ওর কথা শুনে তো মনে হয়,—

—লাট সাহেবের মেয়ে না? ওর বাপের বাড়ির কথা আমাকে আর বোলো না। কলকাতায় অনেক সুখ, অনেক আরাম, অনেক সুবিধা আছে জানি। কিন্তু এরা যখন কলকাতায় থাকবার কথা বলে, তখন কি আনন্দে যে বলে, আমি তো ভেবে পাই না।

বন্ধুর ভবিষ্যৎ ভেবে হৃষীকেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল।

রমা বললে, তুমি ভেবে না পেলে কি হবে! ওরা ভেবে পেয়েছে একটা কিছু। আমি তো যা বুঝলাম, ওরা যাবেই। তোমার বন্ধুর যদি এখানেই ওদের রাখবার ইচ্ছা হয়, তাহলে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে।

সবিস্ময়ে হৃষীকেশ বললে, চাকরী ছেড়ে দিতে হবে? কেন?

রমা বললে, না তো কি? চন্দ্রমুখী একলা থাকতে পারবে না।

—এ কথাও হয়েছে না কি?

—না হলেও হবে।

হৃষীকেশ ভীষণ রেগে গেল। বললে, ব্রজেনকে তো জান। রাগলে ও গুরুর খাতির রাখে না। দ্বিতীয় পক্ষের সুন্দরী বৌ বলে এখন হয়তো একটু খাতির করছে। কিন্তু, তোমার বন্ধুকে বোলো, বেশি বাড়াবাড়ি যেন না করে। ওর চণ্ডাল রাগ। একবার রেগে গেলে চোখে অন্ধকার দেখিয়ে দেবে। সে বড় কঠিন লোক!

হৃষীকেশ রেগে দুম দুম করে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু রমা ভয় পেলে বলে মনে হল না। বরং মনে মনে হাসতে লাগল: পুরুষ মানুষের দৌড় জানতে তার বাকি নেই।

*

কিন্তু ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হৃষীকেশ বুঝলে, রমা একেবারে বাজে কথা বলেনি। হয়তো ভিতরে ভিতরে একটা শেষ চেষ্টা করছে চন্দ্রমুখীকে বোঝাবার জন্যে। কিন্তু বোঝাতে যে পারবে, সে ভরসা ওর নিজের মনেই নেই।

বললে, মহা মুস্কিল রে ভাই! কি যে করি!

হৃষীকেশ বললে, দ্বিতীয় পক্ষে মুস্কিল তো থাকবেই। তাতে করার আর কি আছে।

ব্রজেন্দ্রের আত্মাভিমানে ঘা লাগল। বললে, না রে ভাই, দ্বিতীয় পক্ষ-টক্ষ নয়। ও সব আমি গ্রাহ্য করি না। মেয়ে-মানুষ টিট্ করতে জানি। কিন্তু মুস্কিলটা কি হয়েছে জান?

—আমি তো জানতাম, দ্বিতীয় পক্ষের চাঁদমুখ নিয়েই মুস্কিল। কিন্তু তুই বলছিস।

ব্রজেন্দ্র তার স্বাভাবিক গর্জনের সঙ্গে বাধা দিলে। ফের সেই দ্বিতীয় পক্ষ আর চাঁদমুখ! বলছি তা নয়।

—নয়? বেশ, তাহলে ব্যাপারটা বল।

—ভয়।

—ভয়! কিসের ভয়?

—শেয়ালেও আর হুতোম পেঁচার।

—কি সর্বনাশ! ভদ্র মহিলাকে বাঘ নিয়ে ঘর করতে হবে, আর শেয়ালে ভয়? না কি বাঘই শেয়াল হয়ে গেল!

খোঁচাটা ব্রজেন্দ্র গায়ে মাখল না। বন্ধুদের সঙ্গে কত ঝগড়াই বা করা যায়। খোঁচা তারা দেবেই।

বললে, শহরের মেয়ে। ওসবের ডাক তো শোনেনি কখনও। শুনলেই ওর মুখ ছাইএর মতো শাদা হয়ে যায়।

গম্ভীরভাবে হৃষীকেশ বললে, তাহলে মুস্কিলের কথা সন্দেহ নাই। দুর্বাশার মতো রাগতেই পার, কিন্তু দুর্বাশার মতো অভিশাপ দিয়ে শেয়ালগুলোকে ছাই তো আর করে দিতে পার না! তাহলে করবে কি?

—তাই তো ভাবছি। কি করি বল দেখি?

ব্রজেন্দ্রের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

দুটি পথ আছে।—হৃষীকেশ বললে।

—কি কি?

—এক তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বৌএর কাছে থাক।

—সে কি সম্ভব?

—না। দুই, সবশুদ্ধ নিয়ে কলকাতায় বাসা কর।

সেও কি সহজ?

—না। প্রথমটি অসম্ভব, দ্বিতীয়টি কঠিন।

—দেখি ভেবে।

হৃষীকেশ মুখ টিপে হাসতে হাসতে চলে গেল। ব্রজেন্দ্র ভাবতে বসল। কিন্তু ভাববারই বা সময় কই? রাত্রের ট্রেণেই ফিরতে হবে।

চন্দ্রমুখী পরিষ্কার বলে দিলে, রাত্রের ট্রেণে যদি যাও, আমরাও সঙ্গে যাব। ক'দিন বাপের বাড়ীতে থেকে তারপরে কাছাকাছি একটা বাসা খুঁজে নিলেই চলবে।

শুনে ব্রজেন্দ্রের সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে গেল! কিন্তু সে সাড়া দিলে না।

বিকেলে হৃষীকেশ যখন যথারীতি জিজ্ঞাসা করলে, তোর তো ঘুম ভাঙ্গে। আমাকে না ডেকে যাসনে যেন, সেবারকার মতো। ব্রজেন্দ্র গম্ভীরভাবে বললে, আমি রাত্রির ট্রেণে যাচ্ছি না বোধ হয়।

—যাচ্ছিস না? ছুটি নিয়েছিস? বলিসনি তো কই!

—ছুটি নিইনি নোব।

—হঠাৎ ছুটি নিবি।

হৃষীকেশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। ব্রজেন্দ্র ওর মুখের দিকে চাইলে দেখতে পেত, ওর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা লিকলিক করছে।

কিন্তু ব্রজেন্দ্র মুখ তুলে চাইলে না। চাইবার সাহসেরই তার অভাব ঘটেছে। বললে, অনেকগুলো ছুটি পাওনা আছে, শরীরটাও ভালো লাগছে না। ভাবছি কয়েক দিন বিশ্রাম নোব।

—তাই নে। তোর বিশ্রামের দরকারও হয়েছে।

হৃষীকেশ ফিক্ করে হেসে ফেললে।

ব্রজেন্দ্র চোখ তুলে চাইতেই এই হাসিটা তার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাগে ব্রজেন্দ্রর পিত্ত জ্বালা করে উঠল: হাসছিস! হাসলি কেন? হাসির কি আছে?

—না, হাসিনি। বিশ্রাম নে কিছুদিন।

হৃষীকেশ চলে যেতে টুলু ছুটে এসে বললে, বাবা, শীগ্‌গির ভেতরে এস। মা ডাকছেন।

ব্রজেন্দ্র একবার অপসৃয়মান হৃষীকেশের দিকে চাইলে, সে এই তলবটা শুনতে পেলে কি না। পায় নি হয়তো। কি হয়তো পেয়েছে, বন্ধুমহলে এই নিয়ে হাসাহাসি চলবে তাহলে। কিন্তু টুলু দ্বিতীয়বার চীৎকার করবার আগেই সে ভিতরে চলে গেল।

রান্নাঘরের দাওয়ায় পাড়ার মেয়েদের ভীষণ ভিড়। একটা-কিছুকে ঘিরে এই ভিড়। কিন্তু সেই কিছুটা যে কি, বাইরে থেকে ব্রজেন্দ্র ঠিক বুঝতে পারলে না।

টুলু বললে, পুকুরঘাট থেকে ঘড়া নিয়ে আসতে পা পিছলে মা পড়ে গেছেন। কাকিমারা কোনো রকমে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছেন। তারপরে রান্নাঘরে বসতেই অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

সে আবার কি!

ব্রজেন্দ্র এগিয়ে এল। বৌরা তাকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে। কিন্তু সরে গেল না। যে যেখানে ছিল, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, সেইখানেই রইল। পাড়ার একটি মেয়েও সেখানে ছিল। সে চীৎকার করে বললে, শীগ্‌গির মধু ডাক্তারকে ডেকে আনুন। বৌদি অজ্ঞান হয়ে গেছে।

তখনই ছুটে গিয়ে ব্রজেন্দ্র মধু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ভিড় সরিয়ে সে রোগিণীকে পরীক্ষা করলে। জিজ্ঞাসা করলে, হিষ্টিরিয়া আছে না কি?

—জানি না তো।—ব্রজেন্দ্র কাঁচুমাচু করে বললে।

একটা ইনজেক্‌শন দিয়ে ডাক্তার চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই চন্দ্রমুখীর জ্ঞান হল। আরও কিছু পরে পাড়ার মেয়েরা অস্ফুট কণ্ঠে এই সম্পর্কে নানা জল্পনা-কল্পনা, আলোচনা করতে করতে চলে গেল।

সবাই চলে যেতে ব্রজেন্দ্র ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—কি হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী ঘটনাটা বললে। টুলু সংক্ষেপে যা বলেছিল, তারই বিস্তৃত বিবরণ।

ব্রজেন্দ্র বললে, ডাক্তার জিজ্ঞেস করছিল তোমার হিষ্টিরিয়া আছে কি না।

চন্দ্রমুখী অম্লানবদনে মিথ্যা বললে, নেই।

ব্রজেন্দ্র গুম হয়ে চিন্তা করলে, ভয়ে-ভয়ে থাকার জন্যেই এমনটা হয়ে থাকবে হয়তো। বুকটা দুর্বল হয়ে গেছে। হওয়া বিচিত্র নয়। ভয়,—ভিতরে-ভিতরে গুমরে-গুমরে ভয়,—অতি পাজি জিনিস।

ওতে না হতে পারে এমন রোগ নেই! কোন ডাক্তারের কাছে ব্রজেন্দ্র যেন এমনি একটা কথা একদিন শুনেছিল।

বললে, যাও। ভিজে কাপড়টা ছেড়ে ফেলে শুয়ে পড়গে।

চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে উঠে বসল। পড়ে যাওয়ায় কোমরে একটা চোট লেগেছিল ঠিকই। ওঘর থেকে কাপড় ছেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রান্নাঘরে এল।

ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, শুলে না যে!

চন্দ্রমুখী হাসলে। খুব করুণ একফালি হাসি। বললে, রান্না করতে হবে না?

সেই হাসি! সেই করুণ একফালি হাসি, যা তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ওষ্ঠাধরে লেগেই থাকত!

ব্রজেন্দ্রের মাথায় রাগ চড়ে গেল। বললে, না।

চন্দ্রমুখীর কটাক্ষেও ক্রোধ ঘনিয়ে এল: খেতে হবে না?

—না।

এবারে ব্রজেন্দ্রের কণ্ঠস্বব একপর্দা নিচু।

—তবে আর কি!

চন্দ্রমুখী খোঁড়াতে খোঁড়াতে উপরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে টুলু এসে ডাকলে, মা!

—কি রে? ক্ষিদে পেয়েছে? কি খাওয়াই বল তো?

টুলু হেসে ফেললে। বললে, আহা! বাবা তো রাঁধছেন। আলু সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ আর মাছের ঝোল। জান মা,

বিস্ময়ে চন্দ্রমুখী উঠে বসেছে। বাধা দিয়ে বললে, উনি রাঁধছেন কিরে!

—হ্যাঁ মা, সত্যি।—মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে টুলু বললে,—রান্না হয়ে এল প্রায়!

—বলিস কিরে!

—হ্যাঁ।

—এর আগে রেঁধেছেন কখনও ?

—আমরা তো দেখিনি।

—কি রাঁধলেন কে জানে! হয় তো ভাত পুড়ে গেছে, নয়তো সিদ্ধ হয়নি। আর নয় তো তরকারী নুনে পুড়ে গেছে, মুখে দেওয়া যাবে না। দেখি আবার কি করছেন।

চন্দ্রমুখী উঠে রান্নাঘরে গেল। ব্রজেন্দ্র তখন মাছের ঝোলটা নিয়ে ব্যস্ত। চন্দ্রমুখী দেখলে, ওর হাতের কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট ফোস্কা। বোধ হয় মাছ ভাজতে গিয়ে গরম তেল ছিটকে পড়েছে।

—কখনও রেঁধেছে এর আগে ?

ব্রজেন্দ্রের কথা বলার সময় নেই। ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—কিসে কি মসলা দিতে হয় জান ?

এবারে ব্রজেন্দ্র ওর দিকে চাইলে। বললে, টুলুর কাছে জেনে নিয়েছি।

চন্দ্রমুখী হেসে ফেললে। বললে, সর্বরক্ষে! তুমি এক পণ্ডিত, সে আবার তোমার ওপর! দেখি, সর।

ব্রজেন্দ্রের সব গেছে, কিন্তু গোঁ যাবে কোথায়? সে সরবে কি না ভাবছে, এমন সময় হৃষীকেষের গলা পাওয়া গেল : ব্রজেন আছ না কি হে!

সরবার সময় নেই। হৃষীকেশ একেবারে রান্নাঘরে দোরগোড়ায়। তার হাতে একটা বাটি।

চন্দ্রমুখী ঘোমটা টেনে পিছন ফিরে দাঁড়াল। ব্রজেন্দ্র কিন্তু হাতের হাতখানা ফেলে দেবারও সুযোগ পেলে না।

হাতের বাটিটা মেঝের উপর ঠক্ করে নামিয়ে হৃষীকেশ রান্নাঘরের চৌকাঠের উপর উবু হয়ে বসল।

বললে, তুমি রান্না করছ শুনে এলাম। একটু মাছের ঝোল দাও দিকি বাটিটায়। কেমন রাঁধতে শিখলে দেখি!

শুনে ব্রজেন্দ্র কিন্তু রেগে গেল না, চীৎকার করে উঠল না। বরং একগাল হেসে একখানা মাছ, গোটা কয়েক আলু আর একহাতা ঝোল ওর বাটিতে ঢেলে দিলে।

খুঁটিতে ঠেস দিয়ে কুন্তী তার দাওয়ায় নিঃশব্দে বসে ছিল। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতর থেকে একটা মৃদু কাতরানির শব্দ আসছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু তা কুন্তীর কানে যাচ্ছে বলে মনে হয় না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

বস্তির পঁচিশ-ত্রিশটা উনোনে আগুন দেওয়া হয়েছে। তার ধোঁয়ায় সমস্ত বস্তিটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে কুন্তী বসে। তার চোখের সামনে ধোঁয়ার অন্ধকার। মাথার মধ্যেও। অজস্র সীমাহীন চিন্তা মাথার মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

স্বামী ব্যোমকেশ পকেটমার। বেশ ভাল রোজগার ছিল। নগদ পয়সার কারবার। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কী। মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি ছাড়া সে পরতই না। গয়না বিশেষ না থাক, ভাল ভাল শাড়ি কুন্তী এখনও পরে। ভাল ভাল সাবান-স্নো-এসেন্স। ইদানিং লিপস্টিক এবং পেন্ট মাখতেও আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু হলে হবে কী, 'চোরের সাত দিন, সাধুর একদিন'। এবং সেই একদিনের দিন জনৈক ভদ্রলোকের মোটা মানিব্যাগ হাত-সাফাই করে অন্য হাতে পাচার করবার আগেই ব্যোমকেশ ধরা পড়ে গেল।

তারপরে কী মার।

মারের পরের দিনও ব্যোমকেশের নাক-মুখ-চোখ ফুলে ঢোল হয়ে ছিল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। বোধ হয় কেটে গিয়েছিল। কুন্তী নিজের চোখে দেখে এসেছে কোর্টে গিয়ে। কোর্টের তারের-জাল-দিয়ে-ঘেরা লক-আপের মধ্যে ব্যোমকেশ বসে বসে বিড়ি

টানছিল। কুন্তীকে দেখে ওই অবস্থার মধ্যেও হেসে ভরসা দিয়েছিল, ভাবিসনি। শিগগির ফিরে আসব। ছ মাস আর কটা দিন।

সে কী চেহারা। অত্যন্ত কুৎসিত, বীভৎস চেহারা। মাথার বড় বড় চুল উস্কোখুস্কো, তেল পড়েনি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ লাল। অমন যে সুন্দর ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়েছিল, মারের চোটে তা শতচ্ছিন্ন। ধূলায়-কাদায় মলিন।

ধোঁয়ার অন্ধকারে সেই কদর্য মুখ কুন্তীর চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সে শিউরে উঠল। আশ্চর্য। ব্যোমকেশ যে দেখতে এত বিশ্রী, তা একদিনও বোঝা যায়নি। নিজের অজ্ঞাতেই কুন্তীর নাসিকা ঘৃণায় ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এই বয়সে ফিটফাট থাকলে কুৎসিত মানুষকেও সুন্দর লাগে।

বন্ধ দ্বারের ভিতর থেকে আবার একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ এল, "মা! মাগো!"

একবার চঞ্চল হয়ে উঠেই কুন্তী আবার স্থির হয়ে গেল।

ভিতরে গিয়েই বা করবে কী? কী দেবে পীড়িত ছেলের মুখে? পথ্য বলতে কিছুই ঘরে নেই। পাড়ার নিবারণ ডাক্তার অত্যন্ত দয়ালু। অনেক ক্ষেত্রে গরিব-দুঃখীদের কাছ থেকে ফি নেন না। কাজেই তাঁকে ডাকতে পেরেছিল। আজ দুপুরেই তিনি এসে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে গিয়েছেন। বলে গিয়েছেন অসুখটা ভাল নয়। ওষুধ দিতে যেন দেরি না হয়।

তিনি ত বলে গেলেন, কিন্তু কুন্তী করবে কী? একটি ফুটো পয়সা কুন্তীর হাতে নেই। কে জানে ওষুধের দাম কত. কিন্তু যদি চার আনাও দাম হয়, তা-ই বা সে দেবে কোত্থেকে!

আজ দু'মাস হল ব্যোমকেশ নেই। পকেটমারের সংসার এলোমেলো ব্যাপার। যা-কিছু দিনান্তে আসে তা খাওয়া-পরা আর সিনেমাতেই শেষ হয়ে যায়। তার উপর ব্যোমকেশের নেশা-ভাঙ ছিল।

কুন্তীর মনে পড়ে, একটা সন্ধ্যায় তাকে নিয়ে ব্যোমকেশ শুধু ট্যাক্সিতেই পনর-কুড়ি টাকা খরচ করেছে। এমন কত উজ্জ্বল সন্ধ্যার স্মৃতি তার তার মনে জ্বলজ্বল করছে।

সেদিন কে ভেবেছিল, একটা টাকার অভাবে তাদের পীড়িত পুত্র ওষুধ পাবে না।

পকেটমারের ব্যবসাটা, কুন্তীর মনে হল, ভাল ব্যবসা নয়। আজ নয়, অনেক দিন আগেই কুন্তীর এ-ধারণা হয়েছিল।

এর আগে আরও ক-বারই ব্যোমকেশ ধরা পড়েছিল। পকেট মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সব বারই শুধু মারের উপর দিয়েই গিয়েছিল। প্রচণ্ড মার। বহু লোকের চাঁদা করে মার। পুলিশে আর দেয়নি। কিন্তু এমন প্রচণ্ড মার যে, প্রতিবারই বেশ কিছুদিন করে বিছানা নিতে হয়েছিল।

কুন্তী বলেছিল, মারের বহর দেখে সকাতরেই বলেছিল, "এ-ব্যবসা ছেড়ে দাও গো। এর চেয়ে বেলাক মার্কেট ভাল। পুলিশ বড় একটা ধরে না। যদি বা ধরে, এমন মার ত খেতে হয় না।"

ব্যোমকেশ সেদিনও হেসেছিল। যেমন করে কোর্টের লক-আপে এই সেদিন হেসেছিল, তেমনি করেই। যদিচ সেদিন তাকে অমন কুৎসিত দেখায়নি। তখন বাড়ির পুরু নরম বিছানায় শুয়ে ছিল ত। মারের চোটে চোখ-মুখ ফুলে থাকলেও খোঁচা-খোঁচা দাঁড়ি ত ছিল না। পরিধেয় বস্ত্রও এমন শতচ্ছিন্ন মলিন ছিল না। তাছাড়া লক-আপের আবহাওয়ায় সবাইকেই কেমন কদর্য দেখায়।

ব্যোমকেশ হেসে বললে, "দূর পাগলী! যার যা বিত্তি, বুঝলিনি। যে যা জানে, তার তাই করাই ভাল। মারের ভয়ে পিছিয়ে গেলে চলে? মার কি এক রকম? সব জায়গায় মার আছে জানিস?"

ওর কথা ব্যোমকেশ শোনেনি। সেরে উঠে আবার একদিন যখন

মোটা মানিব্যাগ পকেটে করে ফিরে বাড়িতে হাঁকডাক লাগিয়েছিল, মাছ, মাংস, দই, মিষ্টি, ট্যাক্সি করে বেলঘরিয়া, তখন কুন্তীও ভুলে গিয়েছিল সেসব কথা।

তাই হয়।

দুখের কথা ভুলতে মানুষের তিনি মিনিটও লাগে না।

কিন্তু আজ বস্তির ধূমাঙ্কিত অন্ধকারে স্যাঁতসেঁতে দাওয়ায় বসে, যখন সব ঘরে উনোন ধরানো হয়েছে, শুধ্ তার উনোনই জ্বলেনি, বন্ধ ঘরে মার রুগ্ন ছেলে ধুঁকছে, কটা পয়সার অভাবে ঔষধ আসছে না, পথ্য আসছে না,—তখন মনে হচ্ছে ব্যোমকেশ তার কথা শুনলেই ভাল করত।

অথচ উনোনও জ্বলে, ঔষধও আসে, দু-একটা কমলা-লেবুও হয়ত যদি—

কিন্তু চিন্তাটা মনে আসামাত্রই কুন্তা তাকে পত্রপাঠ বিদায় করে দিলে।

"মা, মাগো!"

ঘরের ভিতর থেকে পীড়িত পুত্রের আর্ত কণ্ঠ।

কুন্তী আর চুপ করে বাইরে থাকতে পারলে না। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। কেরোসিনের অভাবে কাল থেকেই রাত্রে আলো জ্বলছে না। আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে ছেলের বিছানার কাছে এসে কুন্তী বসল।

"কী বাবা!"

আন্দাজ করে কুন্তী ওর ললাটে হাত দিলে। উঃ! কত জ্বর।

কুন্তী আবার ডাকলে, "কী গোপাল!"

গোপাল সাড়া দিল না। বিড় বিড় করে কী যেন বলবার চেষ্টা করলে বলে বোধ হল বটে, কিন্তু কথা কিছুই বোঝা গেল না।

কুন্তী ভয় পেয়ে গেল। গোপালের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে এবারে জোরে ডাকলে, "গোপাল! বাবা আমার! জল খাবি?"

কিন্তু গোপাল তবু সাড়া দিল না।

কুন্তী আবার ওর ললাটে হাত দিলে। ওর সারা গায়ে। পায়ের তলা পর্যন্ত। না, ঠাণ্ডা নয়। সমস্ত দেহে জ্বরের উত্তাপ।

মনকে সে প্রবোধ দিলে। না, সেরকম কিছু নয়। ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। আহা, ঘুমোক। বড় কষ্ট পাচ্ছে যতটুকু ঘুমুতে পারে ততটুকুই আরাম।

ডাক্তারের প্রেসক্রপসন তখনও তার মুঠোর মধ্যে।

কিন্তু ওষুধ, ওষুধ আর কই এল! কী করেই বা আসবে।

কুন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রান্না-বাড়ার বালাই ত নেই। একটি দানা চাল নেই ঘরে। গত কদিন ধরে বস্তির লোকদের কাছে ধার করেই চালিয়েছে। আর কারও কাছে পাওয়া যাবে না। ফিরে পাবার প্রত্যাশা না রেখে কে কদিন ধার দিতে পারে? গরিব লোক, ওরাই বা পাবে কোথায়?

শুধু নীলমণি।

কিন্তু তার মন তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে উঠল: না, নীলমণি নয়। নীলমণির কথা একেবারেই নয়। তার চেয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে গোপালের পাশে তার বুকের উপর হাতটি রেখে শুয়ে পড়া ভাল।

কুন্তী শুতেই যাচ্ছিল, হঠাৎ তার মনে হল ব্যোমকেশের কল্যাণে বাড়িতে মানিব্যাগ নিতান্ত কম জমেনি! সেগুলো ভাল করে খুঁজে দেখলে হয় না? কোনটার মধ্যে এক-আধখানা নোট থেকে যেতেও ত পারে।

চিন্তামাত্র আশায়-আনন্দে তার নির্জীব দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসে সে অন্ধকারের মধ্যেই খুঁজতে আরম্ভ করল, টিনের তোরঙ্গ দেওয়ালের কুলুঙ্গি যেখানে যত মানিব্যাগ থাকতে পারে। ছেঁড়া-নতুন, বড়-ছোট নানা রকমের মানিব্যাগ।

উত্তেজনায় অন্ধকারে যেন তার চোখ জ্বলছে। এখানে-ওখানে জঞ্জালের নীচে যেখানে যত ব্যাগ আছে, সব যেন তার চোখে পড়ছে। একটার পর একটা করে ব্যাগ নেয়, তার খোপে খোপে বিদ্যুৎ-বেগে হাত ঢুকোয়। কিছু হাতে ঠেকে না, তখন মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আবার একটা নেয়।

এমনি করে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ একটা ব্যাগে কাগজের মত কী যেন একটা হাতে ঠেকল। এক টাকার নোট হতে পারে, পাঁচ টাকার নোটও হতে পারে। উত্তেজনায় কুন্তীর সমস্ত শরীর ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। সেই নিবিড় অন্ধকারেই সেখানা গভীর আগ্রহে চোখের সামনে তুলে ধরল। কিছু দেখা গেল না। কিছু বোঝাও গেল না।

বিড়াল যেমন শিকার ধরে চক্ষের পলকে লাফ দেয়, তেমনি করে লাফ দিয়ে সে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে সভয়ে চিৎকার করে উঠল ঃ কে রে।

ম্যালেরিয়ার রোগীর মত কম্প যেন কুন্তীকে অবশ করে আনছে। ভল্লুকের মত কী যেন একটা তাকে সাপটে জড়িয়ে ধরেছে।

"আমি। আমি কুন্তী, নীলমণি। গোপাল কেমন আছে?"

কুন্তীর কাঁপুনি আর থামে না। এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু সম্বন্ধে তার চৈতন্য যেন লোপ পেয়েছে। কেন্দ্রীভূত হয়েছে হাতের কাগজখানার উপর।

"দেখ ত এখানা কী? ক টাকার নোট?"

বলতে গিয়ে তার দাঁতে দাঁতে যেন বাজনা বাজছে।

"নোট?" বাইরের স্বল্পালোকের দিকে কাগজখানা তুলে ধরে নীলমণি বললে "নোট কিসের? এ ত একটা চিরকুট!"

"চিরকুট!"

কুন্তীর কম্প যেন কমতে আরম্ভ করল। কিন্তু তার দেহ অসম্ভব রকম দুর্বল। দেহে প্রাণ নেই যেন।

ওর কথার জবাবে নীলমণি বললে, "হ্যাঁ, চিরকুট। হলদে রঙের একখানা টুকরো কাগজ। ইংরেজীতে কী যেন লেখা আছে।"

সে-কথা কুন্তীর কানে গেল কি না বোঝা গেল না। অস্ফুট স্বরে তার আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলে, "চিরকুট!"

"হ্যাঁ।" নীলমণি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, "অমন করে কাঁপছ কেন তুমি? ভয় কিসের? আমি নীলমণি।"

নীলমণি। সেই নীলমণি, যে তার স্বামীর বন্ধু। অদ্ভুত একটা পোশাক পরে নুপুর পায়ে কাগজের ভেঁপু বাজিয়ে চানাচুর বিক্রি করে। বিকেলে বেরিয়েছিল, এইমাত্র ফিরে নূপুর পোশাক ছেড়ে গোপালের খবর নিতে এসেছে। এখন কত রাত্রি কে জানে।

একটু একটু করে কুন্তীর আচ্ছন্ন ভাবটা যেন রাত্রিভোরের অন্ধকারের মত ফিকে হয়ে আসছে।

ব্যোমকেশের পরম বন্ধু নীলমণি। এই ঘরে কত রাত্রি পর্যন্ত তারা দুই বন্ধুতে মদ খেয়েছে। কুন্তী সযতনে তাদের জন্যে কাঁকড়ার তরকারি রেঁধে দিয়েছে। আরও কত কী। আর যখনই সেইসব একটা একটা করে দিতে এসেছে, নীলমণি কত রকম অশ্লীল রসিকতা করেছে। আনন্দে ব্যোমকেশ দাঁত বের করে হেসেছে। বন্ধুরা ওরকম রসিকতা করেই থাকে। তাতে দোষের কিছু নেই। ব্যোমকেশের চলে যাওয়ার পর থেকে তার অনুপস্থিতির সুযোগে সেই রসিকতা যেন আরও বেড়েছে। আরও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ ইঙ্গিতময় হয়েছে তার চোখের চাউনি, ঠোঁটের কোণের বাঁকা হাসি।

অল্প অল্প করে কুন্তীর চৈতন্য যেন ফিরে আসছে। মনে অত্যন্ত ফিকে সাড়া জাগছে। কিন্তু কাঁপুনি তখনও একেবারে থামেনি।

এবারে নীলমণি তার কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিলে, "অমন করে কাঁপছ কেন? ভয় কী? আমি নীলমণি। বুঝতে পারছ না?"

পারছে। বুঝতে পারছে, ও নীলমণি। তার স্বামীর অনেক আনন্দ রজনীর সহচর। চোখের ভাষা ওর যাই হক, ওকে ভয়

নেই। বরাবর ওকে সে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। তারও দরকার নেই। ও নীলমণি।

কোনও উত্তর না পেয়ে নীলমণি জিজ্ঞাসা করলে, "গোপাল কেমন আছে ?"

এতক্ষণে কুন্তীর গলায় স্বর বার হল. "ভাল নয়।"

"জ্বর বেশী ?"

"গা আগুন। পুড়ে যাচ্ছে।"

"ডাক্তার এসেছিল ?"

"হ্যাঁ। বললে, অসুখটা ভাল নয়।"

"ওষুধ লিখে দিয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আনিয়েছ ? খাইয়েছ ?"

কুন্তী নিরুত্তর।

একটু চুপ করে থেকে নীলমণি আবার জিজ্ঞাসা করলে, "সেই কাগজটা কই ?"

কোন কাগজটার কথা বলছে নীলমণি ? তার হাতের চিরকুটটার যেটাকে সে পাঁচ টাকার, নিদেন এক টাকার নোট ভেবেছিল ? বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে কুন্তী ওর দিকে চাইলে।

অসহিষ্ণু ভাবে নীলমণি বললে, "সেই কাগজ টাগো, যেটায় ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়েছে।"

হ্যা, হ্যাঁ, সেই কাগজটা। এদিকে-ওদিক বার কয়েক চেয়ে কুন্তীর খেয়াল হল, গোপালের কাছে শুয়ে পড়বার উদ্যোগ যখন করছিল, সেই সময় আঁচলের খুঁটে সেই কাগজটা বেঁধে রেখেছিল। আঁচল থেকে খুলে সেটা বার করলে।

"দাও।"

চিলের মত ছোঁ মেরে নীলমণি সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে তেমনি ঝড়ের বেগে আবার ফিরে এল। তার এক হাতে ওষুধের শিশি, অন্য হাতে কমলা লেবু।

বললে, "খুব জোরালো ওষুধ দিয়েছে বো। পাঁচ টাকা দাম নিলে।"

বলে ওষুধটা খাওয়াতে যাবে এমন সময় এই এতক্ষণে নীলমণির খেয়াল হল, ঘর অন্ধকার।

জিজ্ঞেস করলে "ডিবে জ্বালনি কেন? তেল নেই?"

সেই থেকে একপাট দরজায় ঠেস দিয়ে কুন্তী দাঁড়িয়েই ছিল।

নীলমণির প্রশ্নে সে সাড়া দিলে না। নিঃশব্দে বাইরের দিকে চেয়ে রইল।

কেরোসিন নীলমণির বোতলেও বোধ হয় নেই। কিন্তু আশা করা যায়, ডিবেয় আছে। সেটা আনলেই কাজ চলে যাবে। মুহূর্তকালের মধ্যে সেই কথাটা ভেবে নিয়ে দাওয়ায় নিঝঝুম উননটার দিকে নীলমণি চাইলে।

জিজ্ঞাসা করলে, "কয়লা আছে?"

এপাশের কোণে খান কয়েক ইটের ঘের দেওয়া জায়গায় কুন্তীর কয়লা থাকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল না, বিশেষ করে কয়লার মত কালো বস্তু দেখা যাবার কথাও নয়। তবু সেইদিকে একবার চেয়ে কুন্তী নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে আছে।

আচ্ছা, তাহলে উনুনটা ধরাও। আমি আসছি।"

বলে নীলমণি নিজের ঘরের দিকে দ্রুতবেগে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে আবার তেমনি ব্যস্তভাবে ফিরে এল। তার এক হাতে একটা রেশন-ব্যাগ, অন্য হাতে একটা ডিবে।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে ডিবেটা জ্বালিয়ে কাঠের পিলসুজের উপর রাখলে। রেশন-ব্যাগটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বললে, "ওতে চাল আছে আর কী কী আনাজও আছে দেখ।

ভ্রম

আমার একটা ভ্রম ছিল, ভাঙতে অনেক দিন লেগেছিল। মায়া বলতেও পারেন! রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুটা মিথ্যে নয়, তাকে সাপ বলে ভাবাটা মায়া।

গোপাল ঘোষ আমার নিকট প্রতিবেশী। একটা বাড়ির সামনের অংশে আমি থাকি, পিছনের অংশে তিনি। দুই বাড়ির মাঝে একটা ছোট পাঁচিল। পরস্পরকে দেখা যায় না, শোনা যায়।

ভদ্রলোক কি একটা বীমা কোম্পানীতে চাকরী করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। তাই বলে বেকার নন। স্বনামে কিংবা বেনামে বোধ হয় বীমার এজেন্সি আছে। দুপুরে খাওয়ার পর ধোপ-দুরস্ত স্যুট পরে প্রায় প্রত্যহই বার হন। দেখলে মনে হয় রোজগার বেশ ভালোই করেন।

কিন্তু এও মায়া।

সকালে আমার বসবার ঘর থেকে দেখা যাবে, পরণে একখানা ছোট ন'হাতি ধুতি। গায়ে একটি ছেঁড়া মলিন গেঞ্জি। পায়ে চামড়া-দেওয়া খড়ম। খট খট শব্দে পাড়া উচ্চকিত করে গোপাল বাবু থলি হাতে বাজারে চলেছেন।

কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, খড়মের শব্দ পেলে বাইরের দিকে আমি চাইবই। চাইলে তাঁর চোখে চোখ পড়বেই। পড়লে সঙ্গে সঙ্গে থলিশুদ্ধ হাত কপালে ঠেকিয়ে বিনীত বাঁকা হাসির সঙ্গে নমস্কার জানাবেন।

অতি অমায়িক ভদ্রলোক।

শীর্ণ হ্রস্ব দেহ। মাথায় টাক। পিছনের চুলগুলি সামনের দিকে নিয়ে এসে সিঁথি কাটা। সুতরাং মনোযোগের সঙ্গে না

দেখলে সেখানেও সর্পভ্রমের সম্ভাবনা আছে। মুখে একটা রহস্যময় হাসি সব সময় পরিপুষ্ট কাঁচা-পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে ঝিলিক মারে।

নিঃসন্তান মানুষ। বাড়িতে স্বামী আর স্ত্রী। পরনে ন'হাতি কাপড় আর ক্রিজদুরস্ত স্যুট। বাজার আর অফিস।

কোনো সাতে-পাঁচে থাকেন না। না রকের আড্ডা, না কিছু। শুধু নিস্তব্ধ বাড়িতে তিনি আর তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলার গলা কখনও শুনিনি। এগারোটার সময় স্বামীকে খাইয়ে, অফিস-না-কোথায় পাঠিয়ে, নিজে দুটি খেয়ে বোধ হয় শুয়ে পড়েন। যিনি নিঃশব্দে কাজ করতে পারেন তিনি যে নিঃশব্দে সমস্ত দিন শুয়ে থাকতে পারবেন তাতে আর বিচিত্র কি!

একে নিয়েও আমার একটা ভ্রম ছিল।

দশ বৎসর পাশাপাশি বাড়িতে আছি। এই দশ বৎসরের মধ্যে দশবারও তাঁকে দেখেছি কিনা সন্দেহ।

একবার সেইটেই বোধ হয় প্রথমবার, সন্ধ্যার কিছু আগে নীচের বসবার ঘরে বসে আছি, দেখছি গোপালবাবু আর একটি ভদ্রমহিলা সামনে দিয়ে পাশাপাশি চলেছেন। লম্বায় চওড়ায় বিপুলকায় একটি মহিলা। রং ফরসা। পরনে লাল চওড়াপাড় একখানা শাড়ি। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চলেছেন।

পাশে গোপালবাবুর ক্ষীণ হ্রস্ব দেহ। ওপাশ দিয়ে গেলে হয়তো অলক্ষিতেই চলে যেতেন। এপাশ দিয়ে যাওয়ার জন্যে দেখতে পেলাম। তাঁর পায়ে খড়ম নেই। পরিধানেও সেই চিরপরিচিত ন'হাত ধুতি নয়। স্যুট।

তিনিও কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নতনেত্রে সোজা চলেছেন। সেই যথাবিহিত নমস্কার জানাবার চেষ্টামাত্র দেখা গেল না।

কিন্তু সেজন্য দুঃখ করার অবসরও পেলাম না। আমার চিন্তা ওই ভদ্রমহিলা স্থূলদেহের জন্যে নয়। ভাবছিলাম, কে উনি?

গোপালবাবুর বাড়িতে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আছেন বলে জানতাম না।

ভাবলাম গোপালবাবুর দিদি।

গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলাম, গোপালবাবুর কি কোনো দিদি আছেন?

নিস্পৃহভাবে গৃহিণী উত্তর দিলেন, কি করে জানব? দেখিনি তো কখনও।

—গোপালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার আলাপ নেই?

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে গৃহিণী বললেন, আলাপ! চোখে ক'বার দেখেছি গুণে বলতে পারি।

বললাম, ভদ্রমহিলা খুব শান্ত মনে হয়। গলা কখনও শুনিনি।

—না। কোথাও বেরোনও না বড়। ওই বাড়িতে বারো মাস তিরিশ দিন একা নিঃশব্দে কি করে থাকেন ভেবে পাই না।

গৃহিণী বললেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, দিদির কথা কি বলছিলে?

—কথা কিছু নয়। একটু আগে গোপালবাবু একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন, তাই বলছিলাম।

—কি রকম দেখতে?

—খুব লম্বা চওড়া। ফর্সা।

শুনে গৃহিণীর হাসি আর থামে না।

—হাস কেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

গৃহিণী হাসতে হাসতেই বললেন, তোমার কথা শুনে।

—এতে হাসির কি আছে?

অনেকক্ষণ পরে গৃহিণীর হাসি থামল। বললেন, দিদি কেন হবেন, উনিই তো গোপালবাবুর স্ত্রী।

—সেকি!—বিস্মিতভাবে বললাম,—কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল গোপালবাবুর চেয়ে অনেক বড়।

—না, বড় নয়। বোধ হয় দু'জনের বয়সের তফাৎ বেশি নয়; তার উপর লম্বা-চওড়ার জন্যে ওই রকম দেখায়।

কি আশ্চর্য! গৃহিণীকে না জিজ্ঞাসা করলে এই ভুল আরও কতদিন থাকত কে জানে।

এর কিছুদিন পরে একদিন নীচের বসবার ঘরে বসে লিখছি, এমন সময় গোপালবাবু এলেন।

সলজ্জভাবে নমস্কার করে জানালেন একটা দরকারে আপনার কাছে এলাম।

—বলুন।

—আপনাদের কলেজে একটি গরীব ছেলের জন্যে ফ্রি কিংবা হাফ-ফ্রি করে দিতে পারেন?

একটু থমকে গেলাম। এরকম প্রস্তাবের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কলেজের সামান্য একজন শিক্ষক। ফ্রি হাফ-ফ্রি দেওয়ায় শিক্ষকের কোনো হাত নেই।

কিন্তু সেকথা বলতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটি কি আপনার আত্মীয়?

—আত্মীয়। —গোপালবাবু, হাসলেন,—দু'বছর আগে চিনতামও না।

গোপালবাবু ছেলেটির পরিচয় দিলেন :

ভদ্রলোকের ছেলে। বাপ নেই। বস্তিতে থেকে দাসীবৃত্তি করে ছেলের বিধবা মা আর দিদি ছেলেটিকে বহু কষ্টে মানুষ করছে। বলতে গেলে ভিক্ষে-সিক্ষে করে। সেই সূত্রে গোপালবাবুর সঙ্গে ওদের পরিচয়। ছেলেটির পড়াশুনায় আগ্রহ দেখে গোপালবাবু বছর দুই থেকে ছেলেটির স্কুলের মাইনে দিয়ে এসেছেন। স্কুলে তার হাফ-ফ্রিও করে দিয়েছেন। পাঁচজনের কাছে চেয়ে চিন্তে ছেলেটি নিজেই বই জোগাড় করত। কিছু গোপালবাবুই কিনে দিয়েছেন।

এমনি করে স্কুলের পড়া চলছিল। এবারে দ্বিতীয় বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছে। ছেলেটির পড়ার বড় ইচ্ছে।

গোপালবাবু চুপ করলেন।

তাঁর পরোপকার প্রবৃত্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। মিথ্যে মর্যাদার মুখোস খুলে বললাম, দেখুন, ফ্রি করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। ওসব প্রিন্সিপালের হাতে। তবে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

হাতজোড় করে করুণ কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন, যদি একটু চেষ্টা করেন। বড় উপকৃত হই তাহলে।

হেসে বললাম, উপকৃত আপনি কেন হবেন, হলে সেই ছেলেটিই হবে।

—না, না। আমিই উপকৃত হব। যখন তার পড়ার ভার একবার নিয়েছি তখন আমারই দায়।

বললাম, আচ্ছা, সে নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। ইতিমধ্যে আপনি এক কাজ করুন। ফ্রি, হাফ-ফ্রি হলেও সে ভর্তি হওয়ার পর। আপনি ওকে রাত্রের ক্লাসে ভর্তি করে দিন।

সাগ্রহে গোপালবাবু বললেন, আমিও তাই ভেবেছি। ইতিমধ্যে কোথাও একটা চাকরী যোগাড় করতে পারলে, নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ভর্তিয় খরচ তো কম নয়। আমার অবস্থাও জানেন।

অবস্থা কেন, ও'র সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু চুপ করে রইলাম।

পাঞ্জাবীর বুকপকেট থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে বললেন, দু'জন বন্ধুর কাছে ভিক্ষে করে আনলাম। কিছু আমিও দোব। কিন্তু তবু তো অনেক দরকার।

আর একখানি দশ টাকার নোট তার সঙ্গে যোগ করে দিয়ে বললাম, সময় বেশি নেই। তাড়াতাড়ি ভর্তি করতে না পারলে কলেজে সীট পাওয়া মুস্কিল হবে।

পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ জানিয়ে ভদ্রলোক উঠলেন। বললেন, দেখি কাল ভর্তিটা তো করিয়ে দিই। তারপর ওর অদৃষ্টে যা আছে, হবে।

ছেলেটির জন্যে চেষ্টা করেছিলাম। তার অদৃষ্টগুণে কয়েক মাসের মধ্যে একটা হাফ-ফ্রিশিপ পেয়েও গেল।

বোধ হয় কাছাকাছি কোন বস্তিতে থাকে। হাফ-ফ্রিশিপের পর একদিন গোপালবাবু তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

চমৎকার ফুটফুটে একটি ছেলে। বয়স বছর পনেরোর বেশি হবে বলে মনে হল না। মুখখানা এমনই কচি।

প্রণাম করে বিনীত হাস্যে দাঁড়াল।

বলতে গেলে পাড়ার কারও সঙ্গে গোপালবাবুর পরিচয় নেই। লোকে তাঁকে দেখেছে, এইমাত্র। চোখের পরিচয়। হয়তো নামটাও কেউ কেউ জানে। জানে কোথায় তিনি থাকেন।

কিন্তু দেখতে দেখতে দাতা হিসাবে পরোপকারী হিসাবে এবং নিঃস্বার্থ সমাজসেবী হিসাবে পাড়ার মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। হয়তো কেউ আমার কাছে শুনেছে, কেউ অন্যের কাছে ; কিন্তু তাঁর নিজের মুখ থেকে বোধ হয় আমি ছাড়া কেউ কিছু শোনেনি। যে যুগে নিজের ঢাক নিজে না পেটালে খ্যাতির কোনো সম্ভাবনা নেই, সে যুগে এ একটা আশ্চর্য ঘটনা।

অথচ গোপালবাবু নির্বিকার। তাঁর সম্বন্ধে পাড়ার লোকের মনে যে একটা সম্ভ্রমবোধ জেগেছে, এবিষয়ে তাঁকে একেবারেই সচেতন বলে মনে হয় না। পাড়ার লোকে তাঁর সম্বন্ধে কি বলে, কি ভাবে—ভালো কি মন্দ—সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো কৌতূহলই নেই।

এখন রাস্তায় তাঁকে দেখলে তাঁকে নমস্কার করে, অনাবশ্যক কুশলপ্রশ্ন করে। সলজ্জভাবে তিনি নমস্কার ফিরিয়ে দেন। কুশল-

প্রশ্নের উত্তরেও বিড়বিড়, করে কিছু বলেন। যদিচ কি বলেন, অধিকাংশ সময়েই তা বোঝা যায় না।

অত্যন্ত লাজুক, নির্বিকার ভদ্রলোক।

তিনি যে শুধু পুরুষ মহলেই সম্ভ্রমের উদ্রেক করেছেন তা নয়। মহিলা মহলও তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। টের পেলাম গৃহিণীর প্রশ্নে :

—সামনের বাড়ির বড় গিন্নী জিগ্যেস করেছিলেন…

—কি ?

—জিগ্যেস করছিলেন, গোপালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

বললাম, আলাপ হয়েছে তো ?

—কি করে হবে ? কত উঁকি ঝুঁকি দিই।

কোনোখান থেকে দেখা যায় না। ভদ্রমহিলা কারও বাড়ি যান না। ওঁর বাড়িও কেউ আসেন বলে মনে হয় না।

পাশাপাশি বলতে গেলে একই বাড়িতে এতকাল থেকেও একজন মহিলার সঙ্গে পাড়ার কোনো মহিলার পরিচয় হয়নি, ভাবতেও বিস্ময় বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, উনি অমন একা-একা কারও সঙ্গে কথা না বলে থাকেন কি করে ?

—উনিই জানেন। অথচ আমরা তো ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। গোপালবাবুর খুব নাম হয়েছে, না গো ?

বললাম, নাম আর কি। তবে লোকটি খুব ভালো। পরোপকারী পাঁচজন গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করেন। নিজের ছেলে-পুলে তো নেই।

—তা ছেলেপুলে তো কত লোকেরই নেই। সবাই কি আর পরের ছেলেকে সাহায্য করে ? তা নয়। লোক ভালো, দয়া-ধর্ম আছে, তাই করেন।

আমিও সমর্থন করে বললাম, দিল না থাকলে কেউ করতে পারে ?

কিন্তু আমার সমর্থনের উপর আমার গৃহিণীর আস্থা কোনদিনই বেশি নয়। বললেন, হ্যাঁ। দত্ত-গিন্নীও তাই বলছিলেন। শুধু গোপালবাবুই নয়, তাঁর স্ত্রীরও খুব প্রশংসা করলেন। বললেন ওঁর স্ত্রীও নিশ্চয় খুব ভালো। তিনি পিছনে না থাকলে, গোপালবাবুই কি পরের ছেলেমেয়েদের জন্যে এত করতে পারতেন ?

—সত্যি ?

এ অভিযোগ আমার গৃহিণীর দীর্ঘদিনের যে, সমাজে নারীর উপর চিরকালই অবিচার হয়ে আসছে।

বললেন, মেয়েরা শুধু নিন্দের ভাগটাই পায়, প্রশংসার ভাগ তো পায় না। সেই মহাভারতের আমল থেকে।

কে জানে, কোথায় মহাভারতে সে কাহিনী আছে। কিন্তু প্রতিবাদ করলাম না। মোট কথা এটা বুঝলাম যে, গোপালবাবুর আলোচনা মহিলা-মহলে এত বেশী হচ্ছে যে, সকলেই গোপালবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বললাম, একদিন সকলে মিলে ও'র বাড়িতে হানা দাও না। বোধ হয় খুব নিরীহ লজ্জাশীলা মহিলা।

মহিলা-মহলেরও তাই ধারণা। কিন্তু বোধ হয় মর্যাদাবোধ এবং সংকোচে বাধছে।

সেদিন সকালে ভদ্রলোক গুটি গুটি আমার বসবার ঘরে এসে খুব কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়ালেন। কুণ্ঠার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ওটা তাঁর প্রকৃতিগত। যখনই আসেন, (অবশ্য খুব কমই আসেন,) কুণ্ঠিত ভাবেই আসেন। কথা বলেন শঙ্কিত সঙ্কোচের সঙ্গে। কিসের শঙ্কা, কিসেরই বা সঙ্কোচ, দুর্বোধ্য।

জিজ্ঞাসা করলাম, খবর ভালো গোপালবাবু? বসুন।

সসঙ্কোচে একখানা চেয়ারের এক পাশে বসে বললেন, খবর ভালো কিছু নয়। সেই যে ছেলেটিকে আপনি ফ্রি হাফ-ফ্রি করে দিয়েছিলেন, তার মায়ের অসুখ খুব বাড়াবাড়ি।

দুঃখের সঙ্গে বললাম, তাই বুঝি?

—হাঁ। ডাক্তার দেখানো, ওষুধ-পথ্যের ত্রুটি কিছু রাখিনি। কিন্তু বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে। আজ সকালে ডাক্তার এক রকম জবাবই দিয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু হয়, ছেলেটি তো খুব বিপদে পড়বে।

—অবশ্য বড় দিদি আছে। কিন্তু মায়ের অভাব কি কেউ পূরণ করতে পারে মশাই!

—ভগ্নিপতি আছেন তো?

না। বিয়ে হয়নি। কে বিয়ে দেবে বলুন। আমার একটি নারী কল্যাণ আশ্রম আছে, সেইখানে কাজ করে। টাকা ত্রিশেক মাইনে পায়। কিন্তু বস্তিতে থেকেও তাতে কি হবে বলুন।

তা বটে।

চিন্তিতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনার বোঝাই বাড়বে বোধ হয়।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন! কার বোঝা কে বয় মশাই, মানুষের কতটুকু শক্তি। যিনি সকলের বোঝা বন, তিনিও ওদের বোঝাও বইবেন। আমি শুধু মিথ্যে ভেবে মরি। না কি বলেন?

আমি সশ্রদ্ধভাবে গোপালবাবুর দিকে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, মাসাজ ক্লিনিকে সত্তর টাকার একটা 'অফার' পেয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছে নেই।

—কেন? সত্তর টাকা করে পেলে দুই ভাই-বোনের তো মন্দ চলবে না।

—কিন্তু জায়গাটা ভালো নয়। মেয়েটির রূপ আছে, বয়সও

কাঁচা। বুঝলেন না ?—গোপালবাবু কটাক্ষে হাসলেন,—এ আমার চোখের সামনে রয়েছে। নিশ্চিন্ত আছি।

তা বটে। নিঃশব্দে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছেন না কেন ? কি জাত ?……

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক জানি না মশাই। মনে হয় নিচু জাতই হবে। বংশ জানা নেই, পরিচয় জানা নেই, কে বিয়ে করবে মশাই ? বিয়ে দেওয়া মানেও তো আর একটা পরিবারের সর্বনাশ। জেনেশুনে তাই বা কি করে করা যায় ?

তাঁর ধর্মবোধ দেখে শ্রদ্ধা আরও বাড়লো।

গোপালবাবু উঠছেন দেখে তাড়াতাড়ি বললাম, একটা কথা জিগ্যেস করব যদি কিছু মনে না করেন।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঃ বিলক্ষণ! মনে আবার কি করব ? বলুন, কি বলবেন ?

সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু টাকার দরকার ছিল কি ?

গোপালবাবু বললেন, কিছুমাত্র না। টাকা কি হবে ?

বললাম ওষুধ আছে, পথ্যি আছে, ডাক্তারের ফি।

বাধা দিয়ে গোপালবাবু বললেন, ডাক্তার ফি নেন না। আর যে অবস্থায় দেখে এসেছি এতক্ষণ বোধ হয় ওষুধ-পথ্যির প্রয়োজনও শেষ হয়েছে।

গোপালবাবু ম্লানভাবে হাসলেন।

বিকেলেই কি করে যেন খবর পেলাম স্ত্রীলোকটির ভব যন্ত্রণা শেষ হয়েছে। সন্ধ্যার পরে নিজের চোখে দেখলাম, বস্তির একদল ইতর লোকের সঙ্গে গোপালবাবু নিজেই কাঁধ দিয়ে শব নিয়ে চলেছেন।

আমাকে দেখে হাতের ইশারায় জানালেন সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

অন্য বাহকদের খুব প্রকৃতিস্থ মনে হল না। পানোন্মত্ত কণ্ঠে তারা এমন 'হরিধ্বনি' দিচ্ছে যে বুকের ভিতর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। এই একদল ইতর মাতালের সঙ্গে গোপালবাবু চলেছেন শবদাহ করতে।

যারা দেখলে সবাইকে বলতে হল, সমাজসেবা করতে হয় তো এমনি করে। কোঁচা দুলিয়ে, মোটর হাঁকিয়ে আর বক্তৃতার তুবড়ি বাজি দিয়ে সমাজসেবা করা যায় না।

এই অপূর্ব দৃশ্য বাড়ি ফিরে গৃহিণীর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করলাম। শ্রদ্ধায়, পুলকে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

সেই রাত্রেই।

রাত্রি তখন বোধ হয় একটা। হঠাৎ একটা চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। শুধু ঘুম ভেঙে গেল নয়, ভয়ে হাড়ের ভিতরটা পর্যন্ত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

এ রকম কণ্ঠস্বর কখনও শুনিনি। শাঁকচুন্নির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় কার ছিল ভগবান জানেন, কিন্তু লোকের মুখে-মুখে সেই কণ্ঠস্বরের যে পরিচয় প্রকট হয়েছে সেই রকম। শীর্ণ, তীক্ষ্ণ, অমানুষিক।

কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলাম।

আওয়াজটা গোপালবাবুর বাড়ি থেকে আসছে না?

হ্যাঁ।

কার কণ্ঠস্বর? গোপালবাবুর স্ত্রীর? এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো স্ত্রীলোক তো নেই।

মারের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না? কে মারছে? কাকে মারছে?

ঠক করে কাঁপতে কাঁপতেই শুনছি! নিশ্বাস পড়ছে না! বুকের ভিতরটায় কে যেন একটা জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে।

অত্যন্ত দ্রুত ধাবমান নারীকণ্ঠ। সবটা বোঝা যাচ্ছে না।

যেন বললে, শাশুড়ীর সৎকার করতে যাওয়া হয়েছিল! লজ্জা করে না? আজ তোমার একদিন, কি আমার একদিন।

সপাং সপাং চাবুকের শব্দ।

অন্যপক্ষ নিস্তব্ধ।

গৃহিণী ভয়ে আমার হাত চেপে ধরেছেন। কম্পিত ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, ওগো, ঘরে শুয়ে এ রকম শব্দ আমি আরও শুনেছি। তখন কি জানতাম।

তখন-তখনই অনেক-কিছুই জানা যায় না।

বললাম, চল। ঘরে যাই।

আবার শব্দ হল। এবারে যেন চড়ের শব্দ।

ব্যাকুল কণ্ঠে গৃহিণী বললেন, ভদ্রলোক সারারাত্রি অমনি করে মার খাবেন? তুমি গিয়ে বাঁচাবে না? পাঁচিল টপকে—

—যাওয়া যায় জানি। কিন্তু কি হবে গিয়ে? ভদ্রলোকের অভ্যেস আছে, খাচ্ছেন। আমি তো ওই মারের এক ঘা খেলেও বাঁচব না? তা ছাড়া—

আমার কথা বোধ হয় গৃহিণীর কানেই যাচ্ছিল না।

তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, ভদ্রলোক সাড়া দিচ্ছেন না কেন? কিছু হয়ে গেল নাকি?

বললাম, না। কিছু হয়নি। কাল সাড়া পাবে। কি জান, শাশুড়ির মরা পুড়িয়ে রাত-দুপুরে ফিরলে ও রকম একটু আধটু হয়। ঘরে চল।

ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন, শাশুড়ীর মরা কি? কার শাশুড়ীর?

—গোপালবাবুর। আমি কি ভাবছি জান? ভদ্রমহিলার বুদ্ধি আছে। ও কণ্ঠস্বর শোনবার নয় বলেই চুপ করে থাকেন।

এক রকম জোর করেই গৃহিণীকে ঘরে টেনে নিয়ে এলাম।

আত্মা

যাকে বলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে গোষ্পদে ডুবে মরা। পরানের তাই হয়েছে।

বুড়ো মানুষের পকেটে সে হাত দেয় না। দিতে তার পৌরুষে বাধে। বুড়ো মানুষের পকেটে হাত দোব! যে চোখে দেখে না, কানে শোনে না! তেমন হাত কেটে ফেলাই ভাল।

গোঁফ বেরুনোর পর সে হাত দেওয়া দূরে থাক, বুড়ো মানুষের পকেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে চায়নি কখনও। অথচ অদৃষ্টের পরিহাস, সেই বুড়ো মানুষের পকেটেই তাকে হাত দিতে হল, নিতান্ত নাচার হয়ে। এবং ব্যাগটা বের করে সরিয়ে ফেলার আগেই হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল।

ধরলে সেই বুড়ো ভদ্রলোক নয়। গায়ে ধোপ দুরস্ত সাদা চাইনিজ কোট, তার উপর চাদর চাপিয়ে তিনি তাঁর আসনে নিশ্চিন্ত বসে। ধরলে তাঁর সামনের বেঞ্চের একটি ছোকরা।

পরানের ভাব-ভঙ্গিতে তার বরাবরই একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কয়েক বারই পরান বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির পকেটের দিকে হাত বাড়িয়েই আবার সরিয়ে নিচ্ছিল। ছোকরাটি ভাবছিল, সুবিধা হচ্ছিল না বলে বোধ হয় পরান হাত সরিয়ে নিচ্ছিল। পরানের মনের দ্বিধার খবর সে জানবে কী করে? পকেটমারেরও যে আবার পৌরুষের অভিমান আছে একথা কে ভাবতে পারে বলুন।

কিন্তু ছোকরাটির বেশ ভাল লাগছিল। মৎস্যশিকারীর মাছ ধরা দেখতে যেমন আমোদ লাগে, কেমন একটা নেশা ধরে যায়, তেমনি চিরদিন শুনে এসেছে, পকেটমারে পকেট মারে। ষ্টেশনে

ডাকঘরে সাইনবোর্ড দেখেছে; পকেটমার হইতে সাবধান!' 'সাবধান! পকেটমার আপনার কাছেই আছে।'

কিন্তু পকেটমার যে সত্য সত্যই এত কাছে থাকতে পারে, এরকম চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তার কখনও হয়নি।

পরান একবার সন্তর্পণে হাত বাড়িয়েই টেনে নিচ্ছে। যেন ছিপের ফাতনা টিপ টিপ করছে, অথচ ডুবছে না। ট্রামের মধ্যে অসম্ভব ভিড়। সেই ভিড়ের ফাঁক দিয়ে ছোকরার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। এই ভিড়, ভিড়ের ঠেলাঠেলি কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারছে না। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে সে একাগ্র দৃষ্টিতে পরানের হাতের দিকে চেয়ে। নেশা জমে গিয়েছে তার।

দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় কী যেন একটা হয়ে গেল।

ভূমিকম্পে ট্রামটা যেন দুলে উঠল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পরান সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর। সঙ্গে সঙ্গে যেন খোলের ভিতর থেকে কাছিমের মুখের মত একখানা শীর্ণ, দীর্ঘ হাত বেরিয়ে এল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পকেট পর্যন্ত।

হাত নয়, যেন হাতের ছায়া। তার স্পর্শ নেই। এবং এক পলকের জন্যে।

কী হল?

ধাক্কার মধ্যে ছোকরাটির দেহ নড়েছে, কিন্তু চোখ নড়েনি।

কী হল? হয়ে গেল? খেলা খতম?

ছোকরাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। হয়ে গেল কী? এরই মধ্যে হয়ে গেল! তার মন বললে, গেল! কাজ হয়ে গিয়েছে।

পরান সরে পড়বার জন্যে কেবল পিছু হটছে। ছোকরাটি সেই ভিড় যেন তীরের মত ভেদ করে পরানের উপর লাফিয়ে পড়ল।

পরান গর্জন করছে। যাত্রিদল হতচকিত।

কী হল? কী হল?

পকেটমার!

বাস্, আর দেখতে হল না। ট্রামে যে যেখানে ছিল, বসে কিংবা দাঁড়িয়ে, বাহুড়ের মত ঝুল্যমান অবস্থায়, সব ঝাঁপিয়ে পড়ল পরানের উপর এবং—

এবং যে-মারটা চলল, চড়-কিল-ঘুষি, সে-মার গরুমোষেও সহ্য করতে পারে না, শুধু পকেটমারেই পারে।

পরান গোড়ায় গোড়ায় গর্জন করেছিল। চোখ রাঙিয়েছিল। কিন্তু ট্রামশুদ্ধ লোক ঝাঁপিয়ে পড়ার পর চুপ করে গিয়েছিল।

দূর থেকে কে যেন একবার বলেছিল, "যাকগে মোসাই, ব্যাটার খুব সিখ্যে হয়েছে। এবার হুটো লাথি মেরে নামিয়ে দিন।"

আর যায় কোথায়?

সবাই চিৎকার করে উঠল, "ওটাকেও মশাই। এর সঙ্গী ও। পাকড়ান, পাকড়ান।"

কিন্তু পাকড়াবে কে? তার গায়ে হাত পড়বার আগেই লোকটা বিদ্যুদ্বেগে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফ দিয়ে পড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ট্রাম এসে থামল থানার সামনে।

সেইখানে পরানকে নামানো হল। তার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবিটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। পরিধেয় বস্ত্রেরও সেই অবস্থা। মাথার চুল বিপর্যস্ত।

পরান ট্রাম থেকে নেমেই শিথিল বস্ত্র ঠিক করে নিয়ে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করে একটা বিড়ি ধরালে।

বললে, "চলুন, কোথায় নিয়ে যাবেন।"

লোকেরা (মানে নিরীহ লোকেরা নয়। তারা যে-যার সরে পড়েছে। উৎসাহী লোকেরা, যারা থানা-কোর্ট পর্যন্ত অগ্রসর হতে প্রস্তুত) তারা মার বন্ধ করেছে, দয়ায় নয়, ক্লান্ত হয়ে। তখন

• রা হাঁফাচ্ছে। ঠেলতে ঠেলতে তারা পরানকে থানার দিকে নিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে একটা ট্রাফিক পুলিশ এসে পরানের ভার নিয়েছে।

আগে পরান এবং তার হাত ধরে কনষ্টেবল। পিছনে রীতিমত একটা জনতা। এরা সবাই যে ট্রামে ছিল, তা নয়। কিছু রাস্তায় জুটেছে। এবং অধিকাংশই থানা পর্যন্ত যাবেও না।

সবাই মারমুখী। সকলেরই হাত নিশপিশ করছে। কিন্তু পুলিসের জন্যে পরানের গায়ে হাত দিতে পারছে না। শুধু মুখেই শাসাচ্ছে।

কিন্তু পরানের এই সমস্ত শাসানি এবং নানা প্রকার শ্রাব্য-অশ্রাব্য মন্তব্যের দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। যেন কটুক্তি-বর্ষণটা অন্য লোকের উপর চলছে, তরে উপর নয়। সে নিশ্চিন্তে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে। চেষ্টা করছে হন হন করে চলবার। কিন্তু প্রহার জর্জর দেহটা ঠিক পারছে না।

প্রশস্ত রাস্তায় প্রবল জনস্রোত। বেশীর ভাগই অফিস-ফেরত বাবুদের দল। তাদের কেউ পরানকে একবার চেয়ে দেখেই চলে যাচ্ছে। কেউ কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে জেনে নিচ্ছে ব্যাপারটা কী। কেউ বা শেষ পর্যন্ত দেখবার আগ্রহে জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পরানের কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই।

"এইখানে চাঁদা করে একদফা হয়ে যাক না, ও কনষ্টেবল সাহেব!"—দূরের থেকে দোকানের কোন ছোকরা প্রস্তাব করলে।

জনতার এবিষয়ে আগ্রহের অভাব নেই। বস্তুত এইখানে ট্রামের মত একপ্রস্থ হয়ে গেলে জনতারা অনেক খুশী হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কনষ্টেবলটার জন্যে সে সুবিধা নেই।

জনতার উপর পুলিসের ভয় আছে। এইখানে সত্য সত্যই চাঁদা করে একপ্রস্থ হয়ে গেলে তার সাধ্য নেই পরানকে রক্ষা করে। কিন্তু পুলিসের উপর পরানের প্রচুর আস্থা আছে। চারিদিকের

বিরুদ্ধ মন্তব্য এবং ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও সে তাই নিশ্চিন্তে চলেছে বিড়ি টানতে টানতে।

বাঁ দিকের সরু গলিটা তার চেনা গলি। খানিকটা গিয়ে ডান দিকে বেঁকেই একটা জানা বস্তি। সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তাকে ধরে কে? কিন্তু এই দেহ নিয়ে পারবে কি?

এবারে ভয় তার পুলিসের জন্যে নয়। ভারী-বুট-পরা কনেষ্টবলের সাধ্য নেই দৌড়ে তার সঙ্গে পাল্লা দেয়। ভয় তার জনতাকে। তারা ঠিক ধরে ফেলবে। এবং পুলিসের আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় পেলে এই মারমুখী জনতা তাকে আর আস্ত রাখবে না।

সুতরাং গলিটার দিকে একবার চেয়েই সে-সংকল্প পরিত্যাগ করল।

পালাবার লোভটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্যে সে পা চালিয়ে চলতে গেল। সামনেই একটা জীর্ণ ভিখারিণী।

'ভাগ্!'

পরান এমন করে গর্জন করে উঠল যে পাশের কনষ্টেবলটা চমকে উঠল। পিছনের জনতা ইতিমধ্যে খানিকটা হালকা হয়েছে। গর্জনে তারাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিয়ে কনস্টেবলটা ওর হাতে একটা ঝাঁকি দিলে, "কেয়া হুয়া?"

ওর প্রশ্ন পরানের কানে গেল কি-না সন্দেহ। তার চোখে ক্রোধ এবং ভ্রূকুটি: "হারামী কা বাচ্চা কাঁহাকা!"

ভিখারিণীটাও হকচকিয়ে গিয়েছিল। সে ত কিছু করেনি। ভিক্ষাও চায়নি। পরানের কাছ-বরাবর গিয়েছিল বটে, হয়ত ভিক্ষা চাইতেই। কিন্তু তখন ও কনস্টেবলটাকে দেখেনি। বুঝতে পারেনি, পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে একটা চোরকে। তা হলে ওর কাছবরাবর যাবেই বা কেন?

কিন্তু হতচকিত ভাবটা কাটতে দেরি হল না। ভিক্ষা করলেও

সে যে সামান্য নয়, অন্তত একটা পকেটমারের চেয়ে বেশী এই সামাজিক বোধটা ওর মনে জেগে উঠল।

কোমরে সেই মলিন ছেঁড়া কাপড়ের একটা প্রান্ত জড়াতে জড়াতে সেও গর্জন করে উঠল, "তুই হারামীর বাচ্চা। চোর কোথাকার। মারের চোটে গতর ভেঙে দিয়েছে। হাজতে তেল আরও মরবে।"

কিন্তু এসব কথা পরানের কানে গেল বলে মনে হল না। সে তখন খানিকটা দূর চলে গিয়েছে।

জনতার অবশিষ্ট অংশ, যারা থানা অবধি যেত না, তারা এইখানেই মজা পেয়ে গেল। তারা ভিখারিণীকে তাতিয়ে আরও নতুন নতুন মুখরোচক গালাগালি শুনতে লাগল। যদিও যার উদ্দেশে গালাগালি সে তখন প্রায় থানার কাছে।

ছেলেবেলার কথা পরানের ভাল মনে পড়ে না।

শুধু মনে পড়ে পশ্চিমের একটা শহর, সর্দার বলে আলিগড় উলঙ্গ দেহে সেখানকার ধুলোভরা রাস্তায় খেলা করত আরও পাঁচটা ছেলের সঙ্গে। সেখানে একটা আম্মা ছিল। অত্যন্ত রুগ্ন একটি আম্মা, দিনরাত্রি খকখক করে কাশত। আর একটি বাপও ছিল। প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা জাঁদরেল একটা বাপ। অত্যন্ত নিষ্ঠুর। মাকে প্রায়ই ধরে ধরে মারত, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। সেও বাদ যেত না। মারের চোটে মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠত। অজ্ঞান হয়ে যেত। জ্ঞান হলে দেখত, আম্মা চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে। পাশে একটা জলের লোটা। বোধ হয় তার চোখে-মুখে জলের ছিটে দেবার জন্যে।

বাপকে খুব বেশী দেখতে পেত না। মাঝে মাঝেই কোথায় চলে যেত। আম্মা বলত, "কলকাতা গেছে সওদা করতে।" কী

সওদা করতে সে-ই জানে। কিন্তু টাকা-পয়সা জিনিসপত্র আনত অনেক। কদিন খুব খাওয়া-দাওয়া হত। তারপর আবার একদিন বাপ উধাও হয়ে যেত।

সেই সময়টা খুব আনন্দে কাটত। আম্মারও, ওরও। যখন বাপ থাকত না।

যখন বাপ থাকত, ও ত পারতপক্ষে তার ছায়া মাড়াত না। বাইরে বাইরেই থাকত। কিন্তু আম্মার ত সে সুবিধা ছিল না। তাকে থাকতে হত কড়া পর্দায়। সুতরাং মার জুটত কথায়-কথায়, একটু কিছু ত্রুটি হলেই।

মনে পড়ে, একদিন বাইরে থেকে খেলা করে ফিরে এসে দেখে, আম্মা মাটির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। বেশী রক্ত অবশ্য নয়। বেশী রক্ত তার ছিল না।

কী যে করবে সে ভেবে পায়নি। পাশের বাড়ির লোকদের জানানো নিষেধ ছিল। জানালেও বাপের ভয়ে কোন পড়শী আসতে সাহস করত না। পাড়াসুদ্ধ লোক তাকে ভয় করত।

এটুকু জেনেছিল, চোখে-মুখে জলের ছাট দিলে জ্ঞান হয়। তাই দিয়েছিল। একটু পরে আম্মার জ্ঞান হয়েছিল। তখনই কপালের রক্ত ধুয়ে ফেলে আবার রান্নাঘরে গিয়ে রান্না চরিয়েছিল।

আশ্চর্য এই আম্মা! মার খেয়ে কখনও চিৎকার করত না। সমস্ত সময় মুখে ঘোমটায় ঢাকা। বড় বড় নীল দুটি রক্ত হীন চোখ, কখনও কাঁদত কিংবা হাসত বোঝবার উপায় ছিল না।

আলিগড় না কী শহর কে জানে, সেখানকার আর কিছুই পরানের মনে নেই। শুধু আম্মাকে মনে পড়ে।

সেই আম্মার কান-নাক কী রকম ফুলে উঠল। বোধ হয় সেই জন্যেই দিনরাত মুখ ঘোমটায় ঢেকে রাখত। তারপর একদিন হাতে-পায়ে ক্ষত দেখা গেল।

পরানের ধারণা হয়েছিল, মারের জন্যে ঘা বুঝি।

কিন্তু আম্মাই একদিন তাকে বুঝিয়ে দিল, মারের ঘা নয়, খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না। এইবারে সে মরে যাবে। মরে গেলেই অবশ্য বাঁচে। কিন্তু পরানের কী হবে?

ঘায়ের দিকে চেয়ে পরান শিউরে উঠেছিল। তারপরে মরার কথা শুনে, পরানের এখনও মনে পড়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কেঁদেছিল সে।

লুকিয়ে লুকিয়ে মনে সে-পরিবেশে কান্না নিষেধ, জোরে কান্না একেবারেই নিষেধ। আম্মা কাঁদত না, পরানও কাঁদত না। কান্না পরানের আজও আসে না।

এর পরে পরান চলে এল কলকাতায়। এই আড্ডায়। তার বাপ একদিন এসে সেই যে দিয়ে গেল আর আসেনি। আর তাকে দেখেনি। তার জন্যে তার দুঃখ ছিল না। কিন্তু আম্মার জন্যে অনেক দিন পর্যন্ত তার মন-কেমন করত। সেই ঘায়েভরা আম্মা তার বড় বড় নীল রক্তহীন চোখ। তার শব্দহীন অস্তিত্ব যেন মুখর হয়ে উঠত।

তারপর এই আড্ডা।

এখানকার পরিবেশ অন্য রকমের। যে বুড়ো সর্দারের অধীনে তারা পাঁচ-ছটি ছেলে থাকত, তার মায়া-মমতা কিছু ছিল। সময়-সময় নিষ্ঠুর প্রহার দিত সত্যি, কিন্তু মাঝে মাঝে আবার ওদের নিয়ে খেলাও করত।

সেই সর্দারের কাছেই শুনেছিল, আলিগড়ের আগেও তার একটা জীবন ছিল। ওরা তার সত্যকারের বাপ-মা নয়।

ওর বাপের কাছেই সর্দার শুনেছে, এই কলকাতাতেই ওর বাড়ি। হয়ত বস্তির স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে কোন ঝিয়ের কোলে জন্মেছে সে। কি হয়ত নিম্নমধ্যবিত্ত কোন গৃহস্থ-পরিবারে। খেলা করছিল রাস্তায়। সেখান থেকে ওকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল কেউ। তার কাছ থেকে পায় ওর বাপ।

শোনার পর থেকে পরানের মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই খোলার ঘর কিংবা অন্য কোন ঘর, যেখানে ও জন্মেছে, সেটা যদি একবার দেখতে পেত! ফিরে যাবার জন্যে নয়। এই জীবন ছেড়ে আর কোথাও ফিরে যাবার তার ইচ্ছাও নেই, উপায়ও নেই।

কিন্তু যদি একবার দেখতে পেত!

ফিরে যাবার উপায় যখন নেই, ইচ্ছাও নেই, তখন দেখে দূর থেকেই হ'ক আর কাছ থেকেই হ'ক—শুধু দেখে কী যে তার স্বর্গলাভ হত, তা সে বলতে পারে না।

তবু ইচ্ছা হয় দেখবার, তার সত্যকারের মা-বাপ-ভাই-বোনকে। তারা কে কেমন জানবার ইচ্ছা হয়। জেনে লাভ নেই, তবু ইচ্ছা হয়। যেমন সকল মানুষেরই গতজন্মের আত্মজনদের দেখবার ইচ্ছা হয়। সকল সময় নয়, মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কোন আশ্চর্য মুহূর্তে।

এইখানে সর্দারের শিক্ষায় তার হাত পাকতে লাগল।

এমন পাকল যে, সর্দার পর্যন্ত অবাক। প্রথম প্রথম সর্দার নিজে সঙ্গে থাকত। মক্কেল দেখিয়ে দিত। বুঝিয়ে দিত, কী করে জানা যায়, কার পকেটে মাল আছে, কোথায় আছে। কী কৌশলে তা মারা যায়, গোড়ায়-গোড়ায় হাত সাফাইয়ের সেই কায়দাটা নিজে মেরে দেখিয়ে দিত।

তারপরেও কিছুদিন নিজে সঙ্গে থাকত। নিজে মারত না, ওদের মারতে দিত। নিজে সুসজ্জিত বেশে মক্কেলের পাশে বসত। ওদের হাত-সাফাই পর্যবেক্ষণ করত। ভুলভ্রান্তি হলে বাড়ী ফিরে সংশোধন করে দিত।

এমনি করে যে-শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গৃহকোণে, বাইরের জগতে তা সম্পূর্ণ হল।

প্রথম প্রথম পরানের ভয় করত। হাত কাঁপত, বুক শুকিয়ে

যেত। কিন্তু সাফল্যেই সাহস বাড়ে। পরানেরও বাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে পকেটমারার ক্ষেত্রে সে অদ্বিতীয় হয়ে উঠল।

সর্দার বলত, "আঙুল ত নয়, যেন পালকের ছুরি।"

বলত, "ওর চোখে এক্স-রে আছে। হাজার লোকের মধ্যে কোন লোকটির ফতুয়ার পকেটে মাল আছে, ওর চোখের আলো নির্ঘাত সেখানে গিয়ে পড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে পালকের ছুরি কাজ হাঁসিল করে ফেলবে। মাছিটা পর্যন্ত টের পাবে না।"

এর কিছুকাল পরে সর্দার বিছানা নিলে। সবাই তাকে ফেলে যে-যার সুবিধামত সরে পড়ল। কিন্তু সে তাকে এমম অসহায় অবস্থায় ফেলে পালাল না। রয়ে গেল।

সকাল-সকাল রেঁধে-বেড়ে তাকে খাইয়ে সওদা করতে বেরিয়ে পড়ে। বিকেলে ফিরে এসে আবার তার সেবা-যত্ন করে।

তারপরে আজ ধরা পড়ে গেল। পালকের ছুরি কিংবা এক্স-রে কোনটাই কাজে এল না।

সর্দারের জন্যে দুটো ডাব কিনে নিয়ে যাওয়ার কথা। বুড়ো হয়ত অপেক্ষা করে আছে সেই জন্যে।

কনস্টেবলের সঙ্গে চলতে চলতে সেই কথা মনে পড়ে পরান হেসে ফেললে ঃ মর শালা বুড়ো! আমি আর ফিরছি না।

মরবে ত নিশ্চয়ই। সর্দারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। তবু আরও কটা দিন বাঁচত হয়ত, যদি পড়ান ধরা না পড়ত। হয়ত একটু আরামে মরতে পারত।

তা আর কী করা যায়!

সে ত আর ইচ্ছা করে জেলে যাচ্ছে না! ধরা পড়া গেল আর করবে কী? বুড়ো সর্দারের অদৃষ্ট। নইলে সাত সমুদ্র পার হয়ে এসে এই সামান্য গোষ্পোদের জলে ডুববে কেন?

বুড়ো সর্দারেরই অদৃষ্ট। এমনি করে অসহায় অবস্থায় তার মৃত্যু আছে, কে খণ্ডাবে!

সন্ধ্যার মুখে পরান প্রতিদিনই সর্দারের জন্যে একবার ফেরে। তার পরে তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে কোনদিন আবার বেরয়, কোনদিন বা আর বেরয় না।

সন্ধ্যেবেলাটা আজও বুড়ো তার জন্যে অপেক্ষা করবে। হয়ত তার জন্যে, সন্ধ্যের আহারের জন্যে। তাকে ফিরতে না দেখে ভাববে হয়ত। রাত দশটা পর্যন্ত ভাববে। তারপরে বুঝবে, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এবং অঘটনটা কী হতে পারে, তার মত ঘুঘু পকেটমারের বুঝতে বিলম্ব হবে না। তখন, তখন কী করবে সে ?

মর্ শালা ছটফট করে !

থানায় এসে হাজতে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। দারোগা-বাবু বেরিয়েছিলেন। তিনি ফিরতে পরানকে তাঁর সামনে হাজির করা হল।

ডায়েরির বই টেনে দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "নাম কী ?"

'আজ্ঞে, পরান।'

"পরান কী ?"

"আজ্ঞে, আর কিছুই নয়, শুধু পরান।

"বাপের নাম কী ?"

"সে সব জানি না মোসাই।"

"বাপের নাম জানিস না ?"

"না মোসাই, ওসব পাট নেই।

তারপর আবার বললে, "ওসবে কী হবে মোসাই ! যাব ত আমি জেলে। বাপের নাম যাই হক না কেন ?"

"হুঁ।"

"আজ্ঞে। বাপের নাম জানি না। আমার নাম পরান। পরান দত্তও লিখতে পারেন।"

"বক্স আবার কী করে হল ?"

"আজ্ঞে হয়, গেরোর ফের থাকলে সবই হয়।"

দারোগা লিখে নিলে—পরান বক্স, বাপের নাম অজ্ঞাত।

জিজ্ঞাসা করলেন, "পকেট মারতে গিয়েছিলি ?"

"আজ্ঞে আর বলেন কেন হুজুর, ও এক ঝকমারি হয়ে গেল।"

"ঝকমারি! কী রকম ?"

পরান এতক্ষণ বেশ শান্ত ছিল। হঠাৎ কী উত্তেজিত হয়ে উঠল। বললে, "ঝকমারি নয়ত কী! এই আঙুল দেখছেন স্যার ? সর্দার বলত পালকের ছুরি।"

দারোগা হেসে ফেললেন, "তা পালকের ছুরি ভোঁতা হয়ে গেল কী করে ?"

"তবে আর বললুম কী স্যার! ঝকমারি। মাইরি বলছি, গোঁফ বেরুবার পর থেকে বুড়ো মানুষের পকেট আমি ছুঁই না।"

"তবে ছুঁলি কেন ?"

"আজ্ঞে গেরো।"

"গেরো ?"

"না ত কী বলুন স্যার! গেরো। আর সেই ঘেয়ো মাগী।"

বিস্মিত কণ্ঠে দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "ঘেয়ো মাগী আবার কোথায় পেলি ?"

"আজ্ঞে গেরোর ফেরে ফেরে জুটে গেল।"

"কোথায় ?"

"পথে। ঘেয়ো মাগী আর কোথা জুটবে ?"

পরানের কণ্ঠস্বরে তীব্র বিরক্তি প্রকাশ পেল।

দারোগা জিজ্ঞাসা করলেন, "সে কী করলে ?"

"কী আর করবে মোসাই। করেনি কিছুই। একটা ঘেয়ো মাগী আর কী করতে পারে ?"

"তবে ?"

"তা হলে বলি শুনুন।"

থানার সেই হল-ঘরের মেঝে দারোগার টেবিলের নীচে পরান উবু হয়ে বসে পড়ল। বলতে লাগল :

"তিনটে আন্দাজ একটা শিকার জুটে গেল। মাল বেশী ছিল না। খুচরো পয়সাতেই ব্যাগটা ফুলে উঠেছিল। খানকয়েক এক টাকার নোট আর সব খুচরো।"

"কোন্ ট্রামে ?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পরান বললে, "সে একটা শ্যামবাজার যাবার ট্রামে।"

"তারপরে ?"

"সেইটে হাতিয়ে ফুর্তিসে সিস্ দিতে দিতে চলছি—সামনে একটা ঘেয়ো মাগী আলুমিনামের ফুটো বাক্স, হাতে দাঁড়াল।"

"তারপরে ?"

"দিয়ে দিলাম।"

"কী দিয়ে দিলি ?"

বিরক্তিভরে পরান উত্তর দিলে, "আর কী দোব মোসাই, ব্যেগটা।"

"গোটা ব্যাগটা দিয়ে দিলি ?"

"দিলাম বইকি !"

হঠাৎ পরানের চোখটা যেন জ্বলে উঠল : জানেন মোসাই, ঘেয়ো আমি একেবারে সইতে পারি না। সঙ্গে যা থাকে দিয়ে দিই। কতবার দিয়েছি। আর সওদাতে বেরুতাম না হয়ত। কিন্তু সর্দারের জন্যে আবার বেরুতে হল। গেরো আর কাকে বলে ?"

কিন্তু শেষের কথাগুলো দারোগাবাবুর বোধ হয় কানেই গেল না। তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

"ঘেয়ো মাগী দেখলে সব দিয়ে দিস ?"

"বললুম তো স্যার, কতবার দিয়েছি।"

"কেন দিস ?"

"তা জানিনে মোসাই "

পরানের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ বিরক্তি। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ যেন কোন্ সুদূরে উধাও হয়ে গেল : আলিগড় না কোন্ শহরের সেই খোলার বাড়ি। ছোট্ট উঠান। আলো ঢোকে না। সেখানে সেই সর্বদা ঘোমটায় মুখ ঢাকা আম্মা। সেই রক্তহীন নীল চোখ। যে কখনও কাঁদে না, কাঁদতে জানে না। স্বল্পভাষিণী। হাতে-পায়ে ঘা···

মারের ঘা নয়। খুব খারাপ ঘা। এ ঘা কোনদিন সারবে না।

পরান দারোগার দিকে মুখ তুলে চাইলে। কাঁপা গলায় বললে, "ওরা বেশী দিন বাঁচে না মোসাই।"

এরকম ম্যালেরিয়া বড় একটা দেখা যায় না। ঘরে ঘরে রোগী। কেউ দিনে ভাল থাকে, রাত্রে পড়ে ; কেউ রাত্রে ভালো থাকে, দিনে পড়ে। কারো একদিন অন্তর পালা জ্বর, কারো দু'দিন অন্তর। এমনি করে অসুখও চলে, সংসারযাত্রাও বন্ধ নেই।

বন্ধ আছে শুধু ধানকাটা। কাটবে কে ? যারা খেটে খায়, ম্যালেরিয়ার রোগ যেন তাদের উপরই বেশী। পেটের দায়ে একদিন যদি ধান কাটতে যাচ্ছে তো তিনদিন আর উঠতে পারছে না। বিপদ গৃহস্থের, বিপদ মজুরের। সত্যি কথা বলতে গেলে ডাক্তার ছাড়া আরাম আর কারো নেই।

অক্ষয় বাগদীর চেহারাটা ছিল যমদূতের মতো। ছ' ফুট লম্বা দেহ। সমস্ত শরীরটা যেন গুলি পাকানো। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। জোরে কথা বললে ভয়ে বুক শুকিয়ে যেত। কিন্তু ম্যালেরিয়াতে সেই যেন সবচেয়ে বেশি জেরবার হয়েছে। দেহ অস্থিচর্ম সার হয়েছে,—কথা বললে চিঁ চি করে। পূজোর সময় থেকেই ভুগছে বেচারা।

সকাল ন'টায় তিনখানা কাঁথা মুড়ি দিয়ে কেঁপে তার জ্বর এসেছিলো, ছাড়লো বারো ঘণ্টা পরে রাত ন'টায় প্রচুর ঘাম দিয়ে। সমস্ত দিন বেহুস হয়ে পড়েছিল।

ঘরে আলো নেই। তেল পাবে কোথায় ? কিন্তু অন্ধকারেই ঠাহর করলে, মাথার শিয়রে বসে হাওয়া করছে তার বৌ বাতাসী।

অক্ষয় ক্ষীণ কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, জেগে আছিস এখনো ?

ওর সাড়া পেয়ে বাতাসী যেন বাঁচলো। হাতের পাখাটা নামিয়ে রেখে বললো, রাত বেশী হয়নি তো। দশটার টেন যায় নাই এখনও।

—জ্বরটা আজ যেন বেশী হয়েছিল, লয়?

—ওরে বাপরে! এমন জ্বর কখনো দেখি নাই। গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি! কাঁপুনি বটে বাবা। ঝড়ে যেমন ক'রে বড় গাছগুলোকে হিলহিলিয়ে দেয় তেমনি।'

বাতাসী স্ফূর্তির সঙ্গে জ্বরের বর্ণনা দিতে লাগলো।

অক্ষয় জিগ্যেস করলে, খেয়েছিস?—স্বর তার দ্বিধায় শীর্ণ।

বাতাসী সাড়া দিলে না।

অক্ষয় আর একটু পরে জিগ্যেস করলে, ছেলেটা?

—ছুপুর বেলায় মুখয্যে-গিন্নি ছু'টো মুড়ি দিয়েছিল, তাই খেয়েছে।

অক্ষয় আস্তে আস্তে উঠে বসলো।

একটু জল দিতে পারিস?

বাতাসী উঠে মাটির কলসী থেকে অন্ধকারেই একটু জল গড়িয়ে দিলে। ঢক্ ঢক্ ক'রে সব জলটা এক নিশ্বাসে পান ক'রে গেলাসটা অক্ষয় বাতাসীর কাছে নামিয়ে দিলে।

বললে, ক্যানে, মুখুয্যে-গিন্নি ছু'টো ভাত আর তোদের খ'য়াতে পারলে না।

—নিত্যি কে কাকে খ'তে পারে। তবু খুব ক'রে মুখুয্যে-গিন্নি। তা' তেনারাও আর পারছে না। মা লক্ষ্মী তো মাঠেই পড়ে রইলো।

অক্ষয় একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, লক্ষ্মীমাসে কেউ কখনও উপুস ক'রে থাকে না, এবার তাও আরম্ভ হোল। বছরটা কী যে যাবে, তাই ভাবছি।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারই আলো অজস্র ধারায় ফুটো চাল দিয়ে মেঝেয় এসে পড়েছে।

অক্ষয় উঠে দাঁড়ালো।

ব্যস্তভাবে বাতাসী বললে, আবার উঠছ ক্যানে?

উঠি নাই।

বলে অক্ষয় ঘরের ঝাঁপ খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালো। চাঁদ উঠেছে সত্যি, কিন্তু এত কুয়াশা হয়েছে যে দশহাত দূরের গাছ-গুলোকেও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না।

ভয়ে ভয়ে বাতাসী ওর পেছনে এসে দাঁড়ালো। অক্ষয়ের দীর্ঘ ঋজু দেহটা যেন টলছে।

বাতাসী ব্যগ্রভাবে বললে, আর হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। ঘরে এস।

—যাই।

কিন্তু গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চক্‌মক্‌ করে চাইতে লাগলো।

এই চাউনিটাকে বাতাসী ভয় পায়। তাড়াতাড়ি ওর একটা হাত চেপে ধরলো ঃ ঘরে এসো। হিলহিলে হাওয়া দিচ্ছে।

অক্ষয় সাড়া দিলে না। বাতাসী অনুভব করতে পারছে, ওর শরীরের পেশীগুলো যেন কঠিন হ'য়ে আসছে। কোথা থেকে যেন ফিরে আসছে পুরনো জোর আর জেদ।

বাতাসী এবারে ওর হাতটা ধরে ব্যাকুলভাবেই টানলে ঃ এসো।

ওর ব্যাকুলতায় অক্ষয় হেসে ফেললে। বললে, ভয় লাইরে, দূরে যাবার শক্তি নেই। গামছাখানা দে দিকি।

অক্ষয় হাসলে বটে, কিন্তু ওর ভাঙ্গাগলার হাসিটাও এমন ভয়ঙ্কর যে বাতাসীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। অক্ষয়কে সে ভয়ানক ভয় করে। তার রাগ চণ্ডাল।

শুষ্ক কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, কোথায় যাবা? সারাদিন খাও নাই, টলছে তোমার শরীল।

ছেলেটা সারাদিন খায় নাই। তুইও খাসনি।—হেসে বললে, —আমারও ক্ষিদে পেয়েছে। দেখি যদি খেজুরের রস একটু পাওয়া যায়। এই কুয়াশায় ছেলেগুলো জেগে নাই নিশ্চয়।

খেজুরের রস চুরি করতে যাচ্ছে অক্ষয়। তার বিরাট কুকীর্তির তুলনায় এটা একটা অপরাধই নয়। বাতাসীর দুশ্চিন্তা সারাদিন জ্বর এবং অনাহারের পরে শীতের শিশিরে পিছল খেজুর গাছে অক্ষয় উঠবে কি করে? নইলে ক্ষুধা তার নিজেরও পেয়েছে।

গামছাটা এনে দিয়ে বললে, গাছে উঠতে পারবা তো? না আমি সঙ্গে যাব?

অক্ষয় আবার তাই সেই ভয়ঙ্কর হাসি হাসলে। বললে, কাবু করে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনিতে। তা বাদে যে অকা, সেই অকা। হাতে লাঠি থাকলে কারোর বাবার সাধ্যি নেই সামনে দাঁড়ায়। তু ছেলেটার কাছে বোস, আমি এলাম ব'লে।

ব'লে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে কার যেন উদ্দেশে দাওয়া থেকে নামলো।

পা একটু টলছেই বটে। সারাদিনের অনাহার, মাথাটাও ঝিম্ ঝিম্ করছে। তা হোক, ছেলে-বৌ অনাহারে রয়েছে। তার নিজেরও ক্ষুধা পেয়েছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা হাঁড়ি হাতে অক্ষয় ফিরলো।

—রস বেশী পড়ে নাই। একটুন করে গলা ভিজিয়ে নে সবাই। আমাকেও দে একটুন। হাঁড়িটা আবার টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসতে হবে। খামোকা ছেলেগুলোর লোকসান ক'রে লাভ কি বল?

ছোট গ্লাসের এক গ্লাসের বেশী হ'ল না কারো। বাচ্ছা ছেলেটা রসটুকু খেয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসলে।

—আর নাই বাবা ?

—আনছি আবার দাঁড়া।

সারাদিনের পর একটুখানি রস পেটে পড়তে ক্ষুধা যেন আরো চাড়া দিয়ে উঠলো বাতাসীর। তবু বললে, আবার যাবা ?

—যাই। যাব আর আসব।

হাঁড়িটা যথাস্থানে টাঙ্গিয়ে দিয়ে অক্ষয় আর একটা গাছে উঠলো। সে জানে এ গাছটায় রস বেশী পড়ে। কিন্তু ওঠা কষ্টকর। একে তো অনেক লম্বা গাছ দোলে ভয়ানক, তার উপর গাছটা বাঁকা। বেঁকে রাস্তা পর্যন্ত গিয়েছে।

অক্ষয়ের গাটা তবুও টলছিল। তা হোক। পাঁচটা ছোট গাছে ওঠার চেয়ে একটা বড় গাছে ওঠার পরিশ্রম কম।

কুয়াশায় ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছিল না বটে, কিন্তু গাছের ওপর উঠে মাঠের দিক থেকে একটা খসখস শব্দ যেন সে পাচ্ছিল। শব্দটা তার অপরিচিত নয়। বুঝছিল, মাঠের থেকে কে ধান চুরি করে মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছিল।

হায় রে! তার ম্যালেরিয়া, নইলে সে-কি আর এমন দিনে চুপচাপ বসে থাকত!

অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে অক্ষয় রসের হাঁড়িটা খুলে নামবার আয়োজন করলে। হঠাৎ তার মনে হ'ল, খড়সমেত ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে লোকটা প্রায় গাছটার নিচেই এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে,—তার মাথাই ঘুরে গেল, না পা হড়কে গেল,—পড়বি তো পড়, অক্ষয় পড়ল একেবারে তার মাথায়। রসের হাঁড়িটা একদিকে পড়লো দুম করে।

মুহূর্ত মাত্র। এবং এই একটি মুহূর্তেই যেন প্রলয় কাণ্ড হ'য়ে গেল।

যে লোকটা ধান নিয়ে যাচ্ছিল, তার মাথার উপর অক্ষয় পড়তেই এবং পেছনে হাঁড়িটা দুম ক'রে ভাঙ্গতেই, সে অস্ফুটে

'বাবারে' বলেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কিন্তু পড়েও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। দু'বার ড্যাংগড়াগড়ি খেয়েই সে সোজা দাঁড়িয়ে পড়লো এবং চক্ষের পলকে দিল ছুট মরিবাঁচি জ্ঞানশূন্য হয়ে। কুয়াশার অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না।

অক্ষয়ের সাব্যস্ত হ'তে সময় লাগলো। প্রথমতঃ মাথাটা তার আগে থেকেই ঘুরছিলো, তারপরে গাছ থেকে পড়া, তারপরে ভয় পেয়ে লোকটার উর্দ্ধশ্বাসে পালানো। গ্রামেরই লোক, —কিন্তু কুয়াশায় ঠিক বুঝতে পারলে না লোকটা কে। তবে একথা বুঝলে যে, অতর্কিতে লোকটা ভয় পেয়েই পালিয়েছে— হয়ত ভূতের ভয়ে।

অক্ষয় হেসে গা ঝেড়ে উঠলো।

তার সর্বাঙ্গ খেজুরের রসে ভিজে গিয়েছে। ভিজে চ্যাটপ্যাট করছে। তার ওপরে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে, শীতে তার সর্বাঙ্গ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলো। ভয় হ'ল আবার না জ্বর আসে।

চারিদিকে চেয়ে একবার সে দেখলে, লোকটা ধানের বোঝাটার জন্য আবার ফিরছে না। কিন্তু দেখতে পেলে না কাউকে। তখন একটু হেসে পরের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো।

ভারী আছে। কিম্বা হয়ত জ্বরে ভুগে ভুগে তার জোর গেছে কমে। তথাপি বহু কৌশলে বোঝাটাকে আয়ত্ত ক'রে মাথায় তুলে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো।

হাসিও আসে। 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' লোকটা এই শীতে কষ্ট করে আঁটি বেঁধেছে, তারপরে এতবড় বোঝা মাথায় করে এতদূর এসেছে। কিন্তু চোরের মন! লোকটা কোথায় গেলো কে জানে!

অক্ষয় দুর্বল শরীরে বোঝাটা নিয়ে পা-পা করে এগুতে লাগল। চলতে যেন আর পারে না। রস খাওয়ার দফা গয়া। তার বদলে চললো ধান। অন্ততঃ দুটো সপ্তাহ খেয়ে বাঁচবে। কিন্তু পা আর চলে না। দেখা যাচ্ছে তার ঘরখানা। কুয়াশায় আবছা। তারই মধ্যে অন্ধকারে বসে রয়েছে তার স্ত্রী, রোগে, অনাহারে তার কোটর-প্রবিষ্ট চোখে কালি পড়েছে, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে,—আর তার রোগজীর্ণ শিশুপুত্র, সারাদিন উপবাসের পর একফোঁটা রস খেয়ে ভালো লেগেছে তার। দুজনায় বসে রয়েছে রসের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু কোথায় রস? তার বদলে চললো একবোঝা ধান। আজ রাত্রিতে এ ধান তাদের কোন কাজেই লাগবে না। হয়ত আজ রাত্রে কোন মূল্যই এর তাদের কাছে নেই। ছেলেটা হয়ত হতাশ হয়ে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাতাসী সে সুযোগও পাবে না। উপবাস-ক্ষিন্ন জীর্ণ শরীরে এই রাত্রেই তাকে ধান খড় পৃথক করে সামলে ফেলতে হবে। নইলে কাল আবার ধরা পড়ে যেতে পারে।

অক্ষয় হাসলে। ওই বাড়ী, আর কয়েকটা পা।

কিন্তু সেই ক'টা পাও আর চালানো হোল না। পিছনে আচম্বিতে চিৎকার উঠলো, 'চোর, চোর' এবং সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন বলিষ্ঠ হাতে তার কোমরটা জাপটে ধরলে।

মাথার বোঝাটা ফেলে দিয়ে অক্ষয় প্রাণপণে তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে। আর ক' পা মাত্র। ছুটে এইটুকু পার হ'তে পারলে তাকে আর ধরে কে?

কিন্তু পারলে না। ম্যালেরিয়া তাকে একেবারে জীর্ণ করে ফেলেছে।

দেখতে দেখতে লোক জমে গেল। এমন কি বাতাসীও রোগা ছেলেকে নিয়ে ছুটে এলো।

কে চোর ?

একজন একটা দেশলাই জ্বালাতেই দেখা গেল, অক্ষয় মুখ নিচু ক'রে হাঁপাচ্ছে।

বাতাসী ঘটনার অভাবনীয়তায় আর্তনাদ করে উঠলো।

যে দেশলাই জ্বেলেছিল সে ব্যঙ্গ করে বললে, অকা! তোমার সে দিনে ভীষণ জ্বর হয়েছিল।

পেছন থেকে কে বললে, ওদের এমনিই হয়। দিনে জ্বর, রাত্রে ভালো।

সবাই হেসে উঠলো হো-হো করে।

অক্ষয় এতক্ষণে মুখ তুললে। স্থির কণ্ঠে বললে, আমি চুরি করি নাই।

—কর নাই? তা হলে? আর কেউ চুরি করে ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে?

সবাই হেসে উঠলো। অক্ষয়ও। বললে ঠিক তাই দাদা। আমি গিয়েছিলাম রস পাড়তে। চোর যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। পা হড়কে পড়লাম তার বোঝার ওপরে। সে তো পালালো, এখন আমি কি ঝঞ্ঝাটে পড়লাম বল দেখি।

কিন্তু অক্ষয় দাগী চোর। তার মুখের একথা কে বিশ্বাস করবে? লোকে ছুটে গেল দফাদারকে ডাকতে।

জড় হ'ল দফাদার, চৌকিদার এবং আরো অনেক লোক। নানা জনে নানা প্রশ্ন করে তাকে। অক্ষয় তাদের একটা প্রশ্নেরও জবাব দিলে না। শুধু এক সময় বাতাসীকে বললে, হিমে দাঁড়িয়ে থাকিস না। ঘরে যা ছেলে নিয়ে।

ক্রমে বেলা হোল!

চৌকিদার থানায় গেছে দারোগাকে খবর দিতে। হঠাৎ একজন বললে, কিন্তু কোন্ জমির ধান সেটাতো জানা দরকার। অক্ষয় বলবে না। কিন্তু মাঠটা ঘুরে এলেই টের পাওয়া যাবে।

উৎসাহী ক'য়েকটি ছেলে বেরিয়ে পড়লো সন্ধানে। কিন্তু বেশীদূর যেতে হ'ল না। জোলের নিচেই যে ছোট্ট কাচি জমিটা, তারই খানিকটা অংশ শূন্য পড়ে রয়েছে।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

জমিটা অক্ষয়েরই। এ সংসারে একটা ভাঙা ঘর আর ওই একটুকরো জমিই তার সম্বল।

ছাড়া পেলে অক্ষয়। কিন্তু মুখে তার ক্রোধ নেই, হর্ষও নেই। জ্বর আসছে।

টলতে টলতে ঘরে এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়লো। জ্বর ছাড়লো সেই রাত নটায়। সমস্ত দিনের পর অন্ধকার ঘরে আবার সে চোখ মেলে চাইলে।

বাইরে তেমনি কুয়াশা—মোড়া চাঁদের আলো।

সারাদিন খাস নাই কিছু?

বাতাসী সাড়া দিলে না। শুধু জ্বর ছেড়েছে বুঝে হাতের পাখাটা নামিয়ে রাখলে।

অক্ষয় উঠে বসে বললে, একটুন জল দে দিকি, ভারী তেষ্টা!

বাতাসী উঠতে যাবে, হঠাৎ ঝাঁপ খুলে কে যেন ঘরে ঢুকেই বললে, এঃ! আলো নেই ঘরে?

কে?

আমি নিবারণ।

অক্ষয়ের মনে পড়লো গত রাত্রে এই নিবারণই একমাত্র ব্যক্তি যে তাকে একটাও কটু কথা বলেনি।

কি খবর নিবারণ?

বলছি। আগে একটা আলো আনি দাঁড়াও।

আলো নিয়ে ফিরতে দেখা গেল মেঝেয় প্রকাণ্ড এক গামলা ভাত এক জামবাটি ডাল আর চিংড়ি মাছ দিয়ে বেগুনের টক একটুখানি।

সবিস্ময়ে অক্ষয় বললে, এ করেছ কি হে?

কিছুই করি নাই। খাও।—অক্ষয়ের ছেলেটাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, ওঠনারে লবাবপুত্তুর। আমি বাইরে বসি একটুন, বুঝলে? সব খেয়ে দিয়োনা যেন, বৌএর জন্য রেখো একটুন।

আহারান্তে অক্ষয় গামলাটা বাতাসীর দিকে ঠেলে দিয়ে বাইরে আঁচাতে গেল।

নিবারণ তখনও বসে। তামাক টানছে।

কি ব্যাপার বলতো নিবারণ। ধান চুরি করতে গিয়েছিল কে বলতো?

সলজ্জভাবে নিবারণ বললে, আমি।

তুমি? আমার জমিতে?

কুয়াশায় ঠাওরাতে পারি নাই।

বেশ করেছ। বলে নিবারণের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিলে।

কিন্তু তুটো টান দিয়েই হাসতে আরম্ভ করলে।

কি হ'ল?—নিবারণ জিজ্ঞাসা করলে।

উত্তর দেবে কি, অক্ষয়ের হাসি আর থামে না। খানিক পরে বললে, লাগে নাই তো? যা লাশখানি পড়েছিল?

লাশ বটে! সারাদিন মাথা আর তুলতে পারিনি।

সঙ্গে সঙ্গে তু'জনই হেসে উঠলো।

ভরাপেটে কারও মনে কোন গ্লানি নেই।

বৈঠকখানার বারান্দায় একখানা ছিন্ন-মলিন কম্বলের উপর লালবিহারী গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। তখন সকাল বেলা। ন'টাও বাজেনি। কাল রাত্রেই মা তাকে জানিয়েছিলেন, চাল বাড়ন্ত।

ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন নিয়ে পরিবারে অনেকগুলি লোক। এখন শ্রাবণ মাসের মাঝা-মাঝি, আউশ ধান উঠতে অশ্বিনের শেষ। দুর্গত মানুষ যদি অতদিন অপেক্ষা নাও করে, তাহলেও আশ্বিনের মাঝামাঝি অবধি অপেক্ষা করতেই হবে। ঠেঙিয়ে তো আর ধান পাকানো যাবে না।

কার্তিকটা 'আউশে কোনো রকমে কেটে যাবে। অগ্রহায়ণের গোড়াতেই লঘু ধান উঠবে। সেটা ফুরুতে-ফুরুতে আমন ধান পেতে পারবে, তখন, যে পরিমাণ জমি তাদের আছে, তাতে কয়েকটা মাস নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। কিন্তু এই দুটো মাস চালাবে কি করে?

চিন্তার কথা বটে।

গ্রামে ধান বলতে ঘোষালদের ছাড়া আর কারও বিশেষ নেই। অল্প কয়েকজনের হয়তো বছরটা যাবে। কিন্তু অধিকাংশের তারই মতো অবস্থা। অথচ ঘোষালদের কাছে হাত পাততে সে কিছুতেই পারবে না। ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মরে গেলেও না।

সত্য কথা বলতে কি, ওদের যে এই দুরবস্থা সে তো ঘোষালদের জন্যে। ব্রজরাজ ঘোষাল মামলা সুরু করলেন লালবিহারীর পিতামহের সঙ্গে।

সে একটা নয়, এক রকমেরও নয়। দু'জনেরই যথেষ্ট পয়সা। সুতরাং লাগল যখন তখন দেওয়ানীতে ফৌজদারীতে অনেকগুলো

মামলা এক সঙ্গে ঝুলতে লাগল। উভয়পক্ষের সাক্ষীদের আর বাড়ির ভাত খেতে হয় না।

লালবিহারীর পিতামহ আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে কি হত, বলা যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর মামলা চালিয়ে হঠাৎ একদিন তিনি মারা গেলেন। সে মৃত্যুও রহস্যজনক। মহকুমা থেকে ফেরবার পথে হঠাৎ ভেদবমি আরম্ভ হল। বাড়ি অবধি কোনোক্রমে পৌঁছুলেন বটে, কিন্তু রাত্রি আর পার হল না। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মারা গেলেন।

অনেকে বিষপ্রয়োগে মৃত্যু বলে সন্দেহ করতে লাগল এবং এখনও সাধারণের বিশ্বাস তাই। কারণ ব্রজরাজের অসাধ্য কোন কাজ ছিল না।

পিতৃবিয়োগের সময় লালবিহারীর বাবা নিতান্ত নাবালক। বোধ হয় তেরো-চৌদ্দ বছরের বেশি নয়। তাঁর এক মামা এলেন ওদের জমিজমা, সামান্য কিছু জমিদারী এবং মামলা-মোকদ্দমা দেখাশুনা করতে। তার পরে যা হবার তাই হল।

অর্থাৎ ঘরে-পরে মিলে এমন অবস্থার সৃষ্টি করলে যে, দেখতে দেখতে কিছুই আর রইল না। জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। এবং জমি-জমাও ন'কড়া-ছ'কড়ায় চলে গেল। অধিকাংশই কিনে নিলে ওই ঘোষালরাই।

এবং সব যখন গেল, তখন মামলা-মোকদ্দমাও রইল না, মামাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর থেকে এই রকম অবস্থাই চলছে। লালবিহারীর বাবার আমলেও এবং লালবিহারীর আমলেও। ফসল ভালো হলে ন'মাস চলে, না হলে ছ'মাস। বাকি কয়েক মাস এমনি করে লালবিহারী গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

চিন্তা করে।

নিজের কথা, আর সেই সঙ্গে ঘোষালদের কথাও।

পিতামহকে লালবিহারী দেখেনি। তাঁর কথা জানেও না। তবে যারা তাঁকে দেখেছে তারা বলে লোক তিনি মন্দ ছিলেন না। অত্যন্ত জেদী, ক্রোধী এবং বলিষ্ঠ প্রকৃতির লোক। কিন্তু শরীরে নাকি দয়া-মায়া ছিল। গ্রামের পাঁচজনের উপকার করতেন। অন্তত কারও অনিষ্ট করতেন না!

কিন্তু তিনি যাই থাকুন, নিজের পিতাকে লালবিহারী ভালো করেই জানেন। তাঁর পিতার জেদ তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রোধ নয়, বলিষ্ঠতাও নয়। বাইরে তিনি অত্যন্ত নিরীহ ছিলেন বটে, কিন্তু জেদ ছিল প্রবল। তর্ক করতেন না, কলহ করতেন না, কিন্তু মনে মনে যা সংকল্প করতেন তা অন্যের আপত্তি সত্ত্বেও করতেন। আর ছিল অত্যন্ত ধর্মভীরু। কখনও কারও অনিষ্ট মনে মনে চিন্তাও করতেন না এবং যে কাজে অন্যের অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকত, নিজের ক্ষতি সহ্য করেও তা তিনি পরিহার করে চলবার চেষ্টা করতেন।

অপর পক্ষে ব্রজরাজের তুলনা নেই। স্বার্থ ছাড়া কিছুই তিনি বুঝতেন না এবং সেই স্বার্থ সাধনের জন্যে কোন দুষ্কার্যে তিনি পিছ-পা ছিলেন না। খুন, জখম, গৃহদাহ, নারীহরণ, এ সমস্ত তাঁর কাছে নিতান্ত সাধারণ কর্ম ছিল!

তাঁর ছেলেরা এখনও বেঁচে আছে। বাপের মতো কৃতকর্মা না হলেও তারা সাধ্যমত পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবার চেষ্টা করছে, এ তো সবাই জানে।

লালবিহারী যখন নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবে, তখন ঘোষালদের কথাও ভাবে।

'সত্যমেব জয়তি'। কই সত্যের জয় তো হচ্ছে না। ঘোষালরা তো দিব্যি আছে। প্রচুর জমি-জমা, জমিদারী, তেজারতি। এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের টিকি তাঁদের কাছে বাঁধা। তারা উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। আড়ালে অনেকেই গালাগালি দেয় বটে, কিন্তু সামনা-সামনি সকলেই জোড়হস্ত। তাদের প্যাঁচে

পড়ে কত গৃহস্থ যে সর্বস্বান্ত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই এবং এখনও হচ্ছে।

হরেকৃষ্ণের বাবা ব্রজরাজের কাছে একশো টাকা ঋণ করেছিল। এ পর্যন্ত সেই বাবদে ছুশো টাকা দেওয়া হয়েছে। তার পরেও সেই ঋণের দায়ে হরেকৃষ্ণর মৃত্যুর পর তার নাবালক ছেলের নামে ব্রজরাজের ছেলেরা আরও তিন শো টাকা ডিক্রি করে তাদের জমিজমা মায় বসতবাড়ি পর্যন্ত নীলাম করে নিলে।

ঘোষালরা তো বেশ আছে।

লক্ষ্মণ হাজরা ছেলের বিয়ের সময় ঘোষালদের কাছে পঁচিশ টাকা ধার নিয়েছিল। আজ ব্রজরাজও নেই, লক্ষ্মণও নেই। কিন্তু লক্ষ্মণের ছেলে এখনও ওদের বাড়ি বেগার খাটছে। দেনা আর শোধ হচ্ছে না!

ঘোষালরা তো ভালোই আছে।

রামপদ দত্ত শেষ জীবনে অভাবে পড়ে ওদের মুদিখানা থেকে ছু'টাকা এক টাকার জিনিস ধারে নিত হয়তো। তার মৃত্যুর পরে দেখা গেল, বসত বাড়িটা তার ঘোষালদের নামে বিক্রি-কবালা হয়ে গেছে। সবাই বললে, দলিলটা স্রেফ জাল। রামপদর মেয়ে এসে কত কান্নাকাটি করলে। ঘোষালদের দয়া হল না। রামপদর মেয়ে নালিশ করেও হেরে গেল।

কই, ঘোষালদের তো কিছু হয়নি।

'সত্যমেব জয়তি' না ছাতু!

লালবিহারী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ায়। ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, ভগবান-টগবান সমস্ত বাজে।

জ্যায় বিশ্বনাথ! জ্যায় বাবা বিশ্বনাথ! সঙ্গে সঙ্গে চিমটার ঠং ঠং শব্দ।

সেই সন্ন্যাসী। মাথায় লম্বা লম্বা জটা, আবক্ষলম্বিত দাড়ি, মুখে প্রসন্ন হাসি আর।

জ্যায় বিশ্বনাথ! জ্যায় বাবা বিশ্বনাথ!

লালবিহারীর বাপের আমল থেকে এই সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে দর্শণ দেন। একদিন একরাত্রি ওদের জীর্ণ নাটমন্দিরে আশ্রয় নেন। ধুনি জ্বলে। ঘি আসে, আটা আসে। লালবিহারীর বাবার আমলে তো আসতই, লালবিহারীর আমলেও এসেছে। সন্ধ্যাবেলায় ভজন হয়। অনেক রাত্রি অবধি বহু লোকের সমাগম হয়, বিশেষ করে বর্ষিয়সী স্ত্রীলোকের। তারপর ভোর বেলায় কখন তিনি চলে যান, কেউ জানতেও পারে না।

পড়ে থাকে শুধু ধুনীর ছাই। লোকেরা ভক্তিভরে সেগুলো সংগ্রহ করে রাখে।

সন্ন্যাসীর আসার কোনো সময় নেই। কখনও হয়তো পাঁচ-সাত বৎসর পরে আসেন। কখনও দু'তিন বৎসর পরে। আবার কখনও বছর বছর এলেন। এবার এসেছেন বৎসর পাঁচেক পর।

সন্ন্যাসী বড় ভারী সন্ন্যাসী। কত যে তাঁর বয়স কেউ জানে না। কেউ অনুমান করে একশো পেরিয়েছে, কেউ বা দুশো। অথচ মাথার জটা অথবা মুখের দাঁড়িতে ক্বচিৎ দু'চারটে পাকা চুল দেখা যায়। গ্রামের প্রবীণ লোকদের মতে আজীবন সবাই ও'কে ওই একই রকম দেখে আসছে।

কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে এমন একজন সন্ন্যাসীকে দেখেও লালবিহারীর মুখ প্রসন্ন হল না।

পরিষ্কার বলে দিলে, এখানে সুবিধা হবে না বাবা। অন্য কোথাও দেখুন।

কিন্তু এত বড় কঠোর বাক্যেও সন্ন্যাসী কিছুমাত্র হতাশ অথবা ক্ষুণ্ণ হলেন বলে বোধ হল না।

হেসে বললেন, কাহে বাবা?

এবারে লালবিহারী দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল: কাহে বাবা! ভাঁড়ারে একটি দানা চাল নেহি হায়। উন্মুন নেহি জ্বলতা হ্যায়।

আপনি খেতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাক! ঘিউ-রোটি নেহি হোগা।

সন্ন্যাসী হেসে ভাঙা হিন্দিতে জানালেন, ঘিউ-রোটির কিছুমাত্র আবশ্যক নেই। আজ একাদশী, একাদশীর দিন তিনি কিছুই আহার করেন না।

বলে নিশ্চিন্ত মনে নাটমন্দিরে তাঁর অভ্যস্ত জায়গাটিতে ঝুলি-ঝাম্পা নামালেন, কম্বলটি সযত্নে পাতলেন এবং তার উপর আসন গ্রহণ করে প্রসন্ন হুঙ্কার ছাড়লেন ঃ

জ্যায় বিশ্বনাথ! জ্যায় বাবা বিশ্বনাথ!

ভিতর থেকে লালবিহারীর বৃদ্ধা মা বেরিয়ে এলেন তাঁর পাদপ্রক্ষালনের জল নিয়ে। এবং পদধূলি প্রক্ষালিত হবার আগেই গললগ্নীকৃত বাসে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলের ভিড় জমে গেল চারিদিকে।

বৈঠকখানার দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি লালবিহারী দেখতে লাগল ঃ গাঁজার কলকেটি বের করে গুন গুন করে ভজন গাইতে গাইতে নির্বিকার সন্ন্যাসী গাঁজা সাজলেন! সেবনান্তে আবার সরঞ্জামগুলি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখলেন এবং বাবা বিশ্বনাথের নামে আবার একটা হুঙ্কার ছেড়ে স্নান করতে চলে গেলেন। পথ-ঘাট সবই তাঁর চেনা। সঙ্গীর আবশ্যক নেই। তবু কুতূহলী ছেলের দল পিছু পিছু চলতে লাগল। স্নানের ঘাটে সন্ন্যাসী যখন মাথার জটা উন্মুক্ত করবেন, তখন সেই জটার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে তারা অনুমান করতে পারবে।

তাদের আগে আগে আপন মনেই চলেছেন সন্ন্যাসী গুন গুন করে ভজন গাইতে গাইতে। আপন মনেই। যাওয়ার সময় লালবিহারীর দিকে একবার ফিরেও চাইলেন না।

লালবিহারী নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল ঃ

তার মা এসে গঙ্গাজল দিয়ে নাটমন্দিরে বিশেষ একটি কোণ বেশ করে ধুয়ে মুছে দিয়ে কাঠ সাজিয়ে আগুন করে দিলেন।

একটু পরেই সন্ন্যাসী স্নান সেরে গুন গুন করে স্তোত্র আবৃত্তি করতে করতে ফিরে এলেন। মুখে সেই রসস্নময় প্রসন্নতা। বেড়ার উপর ডোরকোপীন এবং বস্ত্রখণ্ড মেলে দিলেন। লালবিহারীর দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করলেন না। আবশ্যকীয় কাজগুলি সেরে ধুনির সামনে গিয়ে বসলেন। কিসের জন্য যেন একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। মুখে এবং সর্বাঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন একটু চঞ্চলতা খেলে গেল। কয়েক মুহূর্ত।

তার পরেই কঠিন, নিস্পন্দ মূর্তি। বাহ্যজ্ঞানরহিত।

এ সমস্তই লালবিহারীর পরিচিত। তবু নতুন করে দেখলে কিছুক্ষণ। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল তার। পরিচিত, অথচ নতুন বোধ হল।

একটু নতুন আছেও। অন্যবার এ সমস্ত হয় গভীর রাত্রে। নাটমন্দির নির্জন হয়ে গেলে। দিনে এরকম ধ্যান করতে লালবিহারী দেখেনি কখনও।

নটবর একটা ধামায় করে চাল নিয়ে তার সামনে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কে তাকে চাল দিতে বললে, কে জানে।

তার পিছু পিছু লালবিহারী ভিতরে গেল।

মাকে বললে, চালের ব্যবস্থা তো হল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সাধুবাবার আটার যোগাড় কি করে হবে? যত্ন করে নাটমন্দিরে বসালে তো!

মা হেসে ফেললেন: আজ একাদশী। নিরম্বু উপবাস সমস্ত দিন। সন্ধের পরে একটু দুধ-গঙ্গাজল খাবেন।

লালবিহারীর মনে পড়ল, সাধুবাবা নিজেও একাদশীর কথাটা যেন বলেছেন একবার।

বললে, তার অসুবিধা না হয় হবে না। কিন্তু যদি আজ একাদশী না হত, কি করতে ?

মা হেসে বললেন, কি আবার করতাম। দু'খানা রুটির ব্যবস্থাও হত নিশ্চয়।

—কি করে হত ? হাতে একটি পয়সা নেই। মুদির দোকানে অনেক বাকি, ধার দেবে না।

মা আবারও হেসে ফেললেন। বললেন, ওরে বোকা, ওঁদের কি আমরা খাওয়াই ? ওঁদের খাবার ঠাকুর নিজে ওঁদের পিছু পিছু বয়ে বেড়ান। খাবার কথা ওঁরা নিজেরাও ভাবেন না, তুইও ভাবিসনে। গাই দোয়াতে লোক এল, বাছুরটাকে ধরগে যা।

দুধের কেঁড়েটা বড় ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে লালবিহারী আবার বাইরে এল।

নাটমন্দিরে এখন আর তেমন ছেলের ভিড় নেই। তারা সন্ন্যাসীর ভজন গানটা কিছু বোঝে। কিন্তু ধ্যানটা নয়। একটা মানুষ অগ্নিকুণ্ডের সামনে নিঃস্পন্দ বসে। চোখ বন্ধ। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। এ ব্যাপারটা তাদের কৌতূহলের সীমানার মধ্যে পড়ে না বোধ হয়। বোধ হয় ভয়-ভয় করে। তারা একে একে সরে পড়েছে।

লালবিহারীর মনে হল, শুধু সন্ন্যাসী নয়, সমস্ত স্থানটাই যেন ধ্যানমগ্ন। জীর্ণ নাটমন্দির, তার সামনের ভাঙা মন্দির, দূরের বেলগাছটি, সমস্ত।

তাদের বাড়ির রাখাল গরু নিয়ে চলে গেল।

গরুর খুরের শব্দে সমস্ত স্থানটা একবার চঞ্চল হয়েই আবার ধ্যানের গভীরে ডুবে গেল। কোথাও কোনো স্পন্দনের চিহ্ন রইল না।

লালবিহারী নিজেও স্পন্দহীন দাঁড়িয়ে।

অত্যন্ত ক্ষীণ অস্পষ্ট একটা অনুভূতি তার মনের কোণে উঁকি

দিলে, সে যেন একটা আবরণের মধ্যে ঢাকা রয়েছে। হাওয়ারই আবরণ। কিন্তু প্রতিদিন যে হাওয়ার বিচরণ করে, সে হাওয়া নয়, অন্য হাওয়া।

ধ্যান ভাঙল সন্ধ্যার পরে।

আরও কিছুক্ষণ কাটল মুহ্যমান অবস্থার মধ্যে। না চেতন, না অচেতন, এমনি একটা অবস্থা। গুনগুনিয়ে সুর উঠছে ভিতর থেকে সেই সুর ধূপের ধোঁয়ার মতো সর্পিল গতিতে উর্দ্ধদিকে উঠে যাচ্ছে।

লালবিহারী সমস্ত জানেন। দুধ-গঙ্গাজল নিয়ে এক পার্শ্বে নিঃশব্দে বসে আছেন। তিনি জানেন, দুধের বাটি কখন সামনে ধরতে হবে। ঠিক সময়ে সেটি ধরলেন।

স্মিতহাস্যে তাঁর দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী দুধটুকু খেয়ে নিলেন।

বুড়ি মা প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন।

লালবিহারী কাছে আসতে সাহস করেনি। দূরে দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে তার উপরে সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়ল। হাত ইসারায় ডাকলেন।

কাছে এসে লালবিহারী তাঁর পায়ের ধুলো নিতে সন্ন্যাসী ওর মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন।

—কেয়া বেটা, ধরম-করম সব ঝুট হ্যায়?

সন্ন্যাসীর কাছে এসে লালবিহারী কেমন যেন ঝিমিয়ে এসেছে। কোনোমতে বললে, সেই রকমই তো মনে হোতো হ্যায় বাবা।

—কেঁও বেটা?

—চোখের সামনে দেখতা হ্যায় বাবা, যারা যত অন্যায় করতা হ্যায়, তারা তত মজামে হ্যায়, আর হামলোক—

বাধা দিয়ে সন্ন্যাসী ঘোষালদের বড় বাড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহি বড়া মকান্‌কি বাৎ বোলতা হ্যায়?

—আবার কেয়া! দেখিয়ে তো, হামলোককো এই যে সব দুরবস্থা হুয়া হ্যায়, সব ওই ব্রজরাজবাবুকো জন্যে।

একটু চিন্তা করে সন্ন্যাসী বললেন, হাঁ ব্রজরাজবাবু।

উৎসাহের সঙ্গে লালবিহারী বলতে লাগল: হেন পাপ নেহি হ্যায় যো উনি নেহি কিয়া হ্যায়—খুন, জখম, ঘরমে আগুন লাগান, মেয়েমানুষ। অথচ দেখিয়ে উন্‌কো বাড়-বাড়ন্ত, আর হামকো ভাত নেই জুটতা। উনকো তো কুছ নেহি হুয়া।

সন্ন্যাসী হেসে বললেন কোন বোলা ?

হাম বোলতা হ্যায়।

ব্রজরাজবাবুকো দেখা তুম ?

নেহি। উন্‌কা মৃতুকা পাঁচ মাস বাদ হাম হুয়া।

হাঁ।—সন্ন্যাসী ঘাড় দোলাতে দোলাতে বললেন,—হাম জানত উ কাঁহা হ্যায়।

জানতা ?—লালবিহারী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

কাঁহা হ্যায় ?

হামারা সামনে।—সন্ন্যাসীর মুখে রহস্যময় হাসি।

আপ দেখতে পাতা হ্যায় ?—প্রশ্ন করতে গিয়ে লালবিহারীর লোম খাড়া হয়ে উঠল।

জরুর।

এই জায়গামে ঘুরে বেড়াতে হ্যায়।

নেহি। হামকো সামনে খাড়া হ্যায়।

সন্ন্যাসী তেমনি মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন। আর লালবিহারী বিস্ময়ে হাঁ করে সেই মিষ্টি হাসির দিকে নির্ণিমেষ চেয়ে রইল।

সন্ন্যাসী তখন ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলতে লাগলেন: দেখো বেটা, দুনিয়ামে যে কাম তুমহি করবে, সেই কামকা ফল তোমাকে নিতে হবে। আগের জন্মে তুমিই ব্রজরাজ ছিলে।

—বলেন কি ?—লালবিহারী প্রায় চীৎকার করে উঠল।

—হাঁ। উ জনমমে এদের তুমি ঠকিয়েছিলে, এ জনমমে সেই ঠকানোর ফল মিলছে। ব্রজরাজ হয়ে তুমি কাম করেছ, লালবিহারী

হয়ে ফল ভোগ করছ। তোমার এক জনমের কামের ফল আর জনমমে মিলছে। ভগবানের বিচারে ভুল হয় না।

লালবিহারীর মাথা ঘুরতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখছে। এক জন্মের ব্রজরাজ, আর জন্মের লালবিহারী? এও কি সম্ভব।

টলতে টলতে গিয়ে লালবিহারী বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

সকালে যখন লালবিহারীর ঘুম ভাঙল সন্ন্যাসী তার অনেক আগে চলে গেছেন।

সারারাত সে স্বপ্ন দেখেছে। এলোমেলো, আবোল-তাবোল স্বপ্ন। এখনও তার মাথা ভার। শরীর অসম্ভব রকম তুর্বল।

নাটমন্দিরের সামনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল? ভাববার চেষ্টা করলে,—সন্ন্যাসীকে এবং তাঁর কথাগুলোও। তার আরও অনেক জানবার ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী চলে গেছেন।

তুখন মাঝির বৌ পিঠে শিশুপুত্রকে বেঁধে পাশ দিয়ে চলে গেল। এই সময় এই পথ দিয়ে প্রায়ই তাকে এইভাবে যেতে দেখে লালবিহারী। তবু অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল।

ওদিক থেকে আসছিল কালী মুখুয্যে। লালবিহারীর বিস্মিত দেখে হেসে বললে এই এক কারবার!

—কিসের?

—এই নিয়ে চলল বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে। গাছের ছায়ায় আফিম খাইয়ে ওকে ফেলে রেখে দিয়ে তুখনের বৌ খেতের কাজে লাগবে।

লালবিহারী যেন কিসের ঘোরে আচ্ছন্ন। কিছুই যেন বুঝতে পারছে না। তুখনের বৌকে না, তার পিঠে বাঁধা বাচ্চাটিকে না কালী মুখুয্যের কথাও না।

বললে আফিম খাইয়ে।

—হাঁ নইলে মায়ের কাজ চলে না।

কালী মুখুয্যে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বাসবী সন্তান সম্ভবা।

এইটে সম্বন্ধে পরিবারের সকলে যখন সুনিশ্চিত হল, তখন বাড়ির মধ্যে এমন একটা সমারোহ পড়ে গেল যেন পৃথিবীতে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা আর ঘটেনি। যেন সৃষ্টিরাজ্যে এই প্রথম একটি মানবী, সন্তান প্রসব করতে চলেছে।

অবশ্য, পৃথিবীতে যাই ঘটে থাক, এ পরিবারে পঁয়ত্রিশ বৎসর পর এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে।

দুই ভাই, অমল ও বিমল। বাসবী বিমলের স্ত্রী, অমল নিঃসন্তান। বিমলের সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কাই প্রায় বদ্ধমূল হতে চলেছিল। এমন সময়, বিবাহের দশ বৎসর পরে বাসবী সেই আশঙ্কা দূর করতে চলেছে। পঁয়ত্রিশ বছর আগে সেই যে শিশুর কাকলী এ বাড়িতে শোনা গিয়েছিল তার পরে এই শোনা যাবে।

বিমল যখন বছর ছয়েকের তখন তার বাবা মারা যান। অমল সেইবার বি এ, দিচ্ছে। পাস করে বাপের শূন্য সে-ই পূর্ণ করে। ভাই হলেও দুজনের বয়সের পার্থক্য অনেকখানি। বলতে গেলে অমল বিমলের বাপের মতন। সেই বিমলকে মানুষ করেছে, তার বিয়ে দিয়েছে।

মা এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে কখন যে তিনি সংসারের সমস্ত ভার বড় বধূ সুরমার হাতে দিয়ে নিজে অবসর নিয়েছেন কেউ টের পায়নি। টের পায়নি এইজন্যে যে, তিনি আছেন। সংসারের মধ্যেই। কিন্তু সংসারের মর্মস্থল থেকে কত দূরে, তা কেউ

কোনোদিন বোঝবার চেষ্টা করেনি। চেষ্টা করলে বুঝতে পারত, বিমল যতটা আদর-যত্ন পেয়েছে মায়ের কাছে তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছে বৌদির কাছে।

সেই অদৃশ্য দূরত্ব থেকেই মা কথা শুনলেন। যে রকম চিৎকার করে সুরমা সুসংবাদটা শোনালে তাতে শোনা ছাড়া উপায়ও ছিল না। শুনে তাঁর মুখ উৎফুল্ল হল নিশ্চয়ই। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসিও দেখা দিল তার পরেই চোখ বন্ধ হয়ে গেল। চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ল। বোধ করি আনন্দে। ঠোঁটটা কয়েকবার নড়ে উঠল। কার কাছে নিঃশব্দে কি যেন জানালেন।

চোখ বন্ধ হল না সুরমার। শুধু দিনেই নয়, রাত্রেও। ওরা দুই ভাই অফিস চলে গেলে সংসারের কাজ কর্ম সেরে সুরমা দুপুরে একটু গড়িয়ে নেয়। গড়িয়ে নেয় তার নিজের কথা। আসলে সেটা নিদ্রা। দু'চার ডাকে ভাঙে না।

কিন্তু সে ঘুমও যেন ছুটে গেছে। দুপুরে শোয়, ঘুমবার চেষ্টাও হয়তো করে। কিন্তু ঘুম আসে না। ওরই মধ্যে বিশবার উঠে দেখে আসে বাসবী কি করছে।

যিনি এ বাড়ির চিকিৎসা করেন, অর্থাৎ কালেভদ্রে কারও অসুখ হলে, তাঁকে এখন প্রায়ই ডাকা হচ্ছে: বাসবীর পক্ষে বেশী ঘুম ভালো কি মন্দ? পরিশ্রম কম করা উচিত না বেশী? খাওয়া-দাওয়া কি রকম হওয়া দরকার? কোন্ খাদ্য উপযোগী—প্রোটিন না কার্বোহাইড্রেট? কোন্ ভিটামিন ঘাটতি পড়েছে? তা পুরণের জন্যে কি করা দরকার?

কিছু খেতে চাচ্ছে না যে ডাক্তারবাবু। কি করা যায়?

অরুচি এখন একটু হবে।

কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে যে! বাচ্চাটা............ .....

বাচ্চাটার জন্যেই সুরমার বেশী চিন্তা। মা দুর্বল হলে বাচ্চাটাও

দুর্বল হয়ে পড়বে। সে তো চলবে না। কত বৎসর পরে এ বাড়িতে বাচ্চা আসছে। একমাত্র বংশধর। কত আরাধনার ধন।

ভর সন্ধে বেলা পেয়ারাতলায় দাঁড়িয়ে কে রে? বাসবী?

ভীতিজড়িত কণ্ঠে বাসবীর উত্তর এল, হুঁ।

তা ছাড়া আর কে হবে! তোকে পই পই করে বলেছি না, ভর সন্ধেবেলা একলা গাছতলায় দাঁড়াবিনে।

একলা নই মুকুল আছে।

মুকুল পাশের বাড়ির একটি ছোট ছেলে। তাকে বাসবী ইশারা করে ডেকে নিয়ে এসেছে দুটো কাঁচা পেয়ারা পেড়ে দেবার জন্যে।

চলে আয়।

সুরমার চোখ সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাসবীর সাধ্য কি তার দৃষ্টি এড়িয়ে দুটো কাঁচা পেয়ারা খায়। সুরমার চোখ থেকে কে যেন ঘুম চুরি করে নিয়ে গেছে।

শুধু সুরমার নিজের চোখ থেকেই নয়, অমলের চোখ থেকেও। রাত্রে খেটেখুটে এসে বেচারা ঘুমুচ্ছে, সুরমার ঠেলা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল : কি ব্যাপার?

ওর ব্যস্ততা দেখে সুরমা হেসে ফেলে : বাবা! তোমাকে ডাকবার উপায় নেই। এমন করে উঠবে যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে।

নিঃসন্তান সুরমাকে অমল ভয় পায়। ভাবে, সে যে নিঃসন্তান সে অপরাধ অমলেরই।

শান্তভাবে শুয়ে পড়ে বলে, কি বলছিলে?

বলছিলাম, সেই প্যারাম্বুলেটারটা—

সে তো রবিবার গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

হ্যাঁ। কিন্তু ভাবছিলাম, কি গাড়ি কেনা যাবে।

কেন, তুমি তো বলছিলে ওপরে ঢাকা-দেওয়া।

বলেছিলাম। কিন্তু কাল একখানা গাড়ি দেখলাম সরকার সাহেবের।

বেশ তো। সেই রকমই কেনা যাবে।

দামটা বোধ হয় বেশী।

তা হোক।

বলে অমল নির্বিবাদে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে। রবিবারের এখনও দেরি আছে।

তার পরদিন একখানা নতুন মহাভারত বাসবীর খাটের পাশে টিপয়ের উপর দেখা গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিমল এবং বাসবী বইখানা ওখানে রাখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করলে। সুরমাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। কি জানি কেন, সুরমার মেজাজ সম্প্রতি অত্যন্ত খিটখিটে হয়েছে। সব সময়ে সে যেন কি ভাবছে। তার মধ্যে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে গেলেই রেগে যায়।

বিমল বললে, কাল বৌদিকে জিজ্ঞেস করো বরং।

ওরে বাবা! তুমি জিজ্ঞেস করো বরং।

ওরে বাবা!

কিন্তু মহাভারতখানার সম্বন্ধে কিছু একটা তো করা চাই। নইলে সেও তো একটা সংঘাতিক ব্যাপার হবে!

তখন অনেক বিচার-বিতর্কের পর বিমল কোথা থেকে একটা লাল শালু এনে সেটা জড়িয়ে দিলে। বাসবী তার উপর সিন্দুরের রেখা আঁকলে। এবং দুজনে মিলে সেটাকে ভক্তিভরে শিয়রের কাছে রাখল।

পরদিন গ্রন্থখানাকে সেই অবস্থায় দেখে সুরমা তো হেসেই অস্থির—এটা কি?

হাসি বাসবীরও আসছিল। কিন্তু ভয়ে হাসতে পারছিল না। বললে, সেই মহাভারতখানা।

তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু ওখানে কেন? ও রকম করে কেন?

মুখ কাঁচুমাচু করে বাসবী বললে, ওটা যে কি করতে হবে?

কি করবার কথা? বই নিয়ে কি করে লোকে? পড়ে।

সবিস্ময়ে বসবী বললে, পড়বার জন্যে মহাভারত।

সুরমা ধমক দিলেঃ হ্যাঁ। জান না এ সময় বীরদের কথা, জ্ঞানী লোকের কথা, ধর্মের কথা পড়তে হয়। তাতে গর্ভের সন্তান বীর হয় জ্ঞানী হয়, ধার্মিক হয়। সেই জন্যেই বইখানা দেওয়া হয়েছে। শালু মুড়িয়ে তেল সিন্দুর দিয়ে মাথার শিয়রে তুলে রাখবার জন্যে নয়।

সুরমার কথা ভেবে বাসবী এবং বিমল ভয় পায়। পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে এ বাড়িতে একটি সন্তান আসছে বলে নিঃসন্তান সুরমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল?

ভয় পান বৃদ্ধা শাশুড়ী। বলেন বড় বৌমা, অত হৈ-চৈ আগে থেকে করো না। আগে সে আসুক, বাঁচুক তার পরে।

শুনে সুরমাও যে ভয় পায় না তা নয়। কিন্তু তার স্বভাবই অমনি। পারে না। একটা ঘর দেখতে দেখতে প্রত্যাশিত আগন্তুকের খাট, বিছানা, জামা-ইজের খেলনায় বোঝাই হয়ে গেল।

অবশেষে যথাসময়ে নবকুমার ভূমিষ্ঠ হল।

এই দিনটির জন্যে বাসবী এবং বিমল উৎসুক হয়ে উঠেছিল। যতটা সন্তানলাভের জন্যে, তার চেয়েও বেশী সুরমার, বরং সেই সঙ্গে অমলেরও কিছুটা উৎপাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে।

সত্য কথা বলতে কি, অমল-সুরমার উৎপাতে বাসবী যেন প্রথম মাতৃত্বের আনন্দই উপভোগ করতে পেলে না। নেই নেই ও করতে নেই, এইটে করতে হবে। ওখানে যেতে নেই, এখানে যেতেই হবে। নিত্য নতুন নতুন নির্দেশ আর অনুশাসনে তাকে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছিল। তার বিশ্বাস হয়েছিল প্রসবের পর সন্তানকে

বড় মায়ের হাতে তুলে দিয়ে তার এই বন্ধন-যন্ত্রণার অবসান হবে। সেইজন্যেই সে দিন গুণছিল।

প্রসবের অব্যবহিত পরে যখন তার চৈতন্য ক্ষীণ এবং অনুভূতি দুর্বল, তখন তার মগ্নচৈতন্যের মধ্যেও বুঝি মুক্তির সেই প্রত্যাশিত সুরটি ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হল।

কিন্তু মুক্তি অত সুলভ নয়।

খোকন একটু নাড়াচাড়া করবার মতো শক্ত হতেই সুরমার কোলে চলে গেল। সুরমা তার জন্যে কর্মতালিকা তৈরী করে ফেললে। কখন সে রোদে থাকবে, কখন ছায়ায়, কখন ঘরের মধ্যে তার ছোট্ট খাটে, কখন দোলনায় কতক্ষণ অন্তর অন্তর খাবে এবং কি খাবে। এই সবের একটা নিখুঁত তালিকা সুরমা তৈরী করে ফেললে।

তালিকাটি যদি কাগজে লিখে পিচবোর্ডে এঁটে দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেওয়া হত, বাসবী বেঁচে যেত। তা নয়। সেটা রয়েছে সুরমার মনের মধ্যে এবং সে প্রত্যাশা করে, খোকন সম্বন্ধে যার যেটুকু করণীয়, (বেশীটা অবশ্য সুরমার নিজের, কিন্তু বাসবী, বিমল, অমল, ঝি-চাকর প্রভৃতিরও নির্দিষ্ট অংশ আছে) সে সেটা নির্ভুলভাবে স্মরণ করে রাখবে। কিন্তু স্মৃতিশক্তি কারও অভ্রান্ত নয়। ভুল সকলেরই হতে পারে। সুরমারও। কিন্তু তালিকার ভিত্তিই হচ্ছে. সুরমার ভুল হতে পারে না। সুতরাং ভুল যারই হোক, তিরস্কার ভোগ করে অন্যান্যেরা। আর, বলাবাহুল্য, তিরস্কারের মোটা অংশই বাসবীর ভাগে পড়ে। প্রত্যহ।

না, মুক্তি আর নেই।

হয়তো খোকনকে দুধ খাওয়াচ্ছে বাসবী। কোথা থেকে ছুটে এল সুরমা হন্তদন্ত হয়ে।

ওটা কি হচ্ছে ?

সর্বনাশ! ভয়ে বাসবীর মুখ শুকিয়ে গেল।

দুধ খাওয়াচ্ছি দিদি!

দুধ খাওয়াচ্ছিস! 'গোবিন্দর ব্যাগাড়' সেরে রাখছিস? এখন ক'টা।

সামনেই দেওয়ালে বড় ঘড়ি। টক টক শব্দ করে চলছে। দুজনেই এক সঙ্গে সেদিকে চাইলে। আটটা

আটটাতেই তো দুধ খাওয়াবার কথা।

বাসবীর বেশ মনে পড়ছে আটটা। কাল সকালেও আটটাতে খাইয়েছে সে।

আটটা না সওয়া আটটা?

সওয়া আটটা! বাসবীর গোলমাল বাধল।

আমার যেন মনে হচ্ছে............

তোমার সব সময়েই ভুলটা মনে হয়। রাখো। আরও তেরো মিনিট অপেক্ষা কর। তখন ওর খাবার সময় হবে।

হয়তো পারাম্বুলেটরটা ঠেলতে ঠেলতে চাকরটা খোকনকে নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে। পিছন থেকে ধমক্ এল দাঁড়া।

গাড়ি দাঁড়াল! সুরমা এল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খোকনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, ঠিক যা ভেবেছি। এ জামাটা কে পরিয়ে দিলে?

ভয়ে ভয়ে চাকরটা বললে—ছোট মা।

ছোট মা! কোথা সে?

বাসবী এসে বললে, ওইটেই তো সামনে সাজানো ছিল।

সাজানো ছিল, আর তুমি পরিয়ে দিলে! ওটা সকালে পরেছিল কি না মনে পড়ল না?

না। মনে পড়ে না। ছেলে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ধমক খেয়ে খেয়ে বাসবীর কিছুই মনে পড়ে না, মনে থাকেও না।

চাকরটা তাড়াতাড়ি বললে, না বড়মা, ওটা নয়। সকালেরটা আমি দুপুরে সাবান দিয়ে ....

তুই থাম।

ধমক খেয়ে সে চুপ করলে। বাসবী কাটের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দিকে কটমট করে চেয়ে সুরমা বললে, ছেলে হলেই মা হওয়া যায় না তার অনেক ঝক্কি।

সে বিষয়ে বাসবীর সন্দেহমাত্র নেই। খোকন কত বড় হলে এই ঝক্কি কাটবে, তাই বাসবীর একমাত্র চিন্তা।

গাড়ি আবার ভিতরে এল। ও-জামা খুলে খোকনকে অন্য জামা পরিয়ে দেওয়া হল। তারপরে চাকর তাকে নিয়ে বেরুলো।

রাত্রে বিমলের কাছে বাসবী কেঁদে ফেললে ঃ—আর তো পারি না বাপু। দিদির জ্বালায় জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

বিমল হাসলে ঃ কি হয়েছে ?

হবে আর কি। খোকন কোথায় আঙ্গুল কেটেছে। তা আমি কি করব বল ? দামাল ছেলেকে কেউ আটকে রাখতে পারে ? আমার আর কাজ নেই ?

তারপরে ?

তারপরে আর কি ! ছেলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেছেন। ছেলে আর আমাকে দেওয়া হবে না।

বেশ তো। থাক্ না।

স্বামীর মূর্খতায় বাসবী হেসে ফেললে। ঝঙ্কার দিয়ে বললে তুমিও দেখছি দিদির মতো অবুঝ হলে ! কি করে থাকবে শুনি ! ওইটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারে ?

বিমল সহাস্যে বললে, না পারে তখন নিজেই দিয়ে যাবার পথ পাবেন না। তোমায় একটা কথা বলি শোন।

বল।

সন্তানের জন্যে বৌদির মনের মধ্যে যে এত বড় ক্ষুধা এতদিন টগবগ করে ফুটছিল, কেউ টের পাইনি। কিছুটা টের পাওয়া গেল যখন খোকন আসার সম্ভবনা হল। কিন্তু সেও যে এত উগ্র ভাবিনি। এখন যেটা চলছে সেটা ক্ষুধা নয়।

তবে ?

ক্ষুধা মিটে যায়। খোকনকে পেয়ে বৌদিরও ক্ষুধা মিটে যাওয়া উচিত ছিল।

উচিত ছিল তো মিটলো না কেন ?

কারণ এটা ক্ষুধা নয়।

তাহলে কি এটা ?

জানি না।

বিমল একটু থেমে কি যেন ভাবতে লাগলো। তারপর বললে, পরিচয় যা পাচ্ছি তা হচ্ছে প্রত্যেক মুহূর্তে খোকার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা খোকন কারও নয়! তুমি প্রসব করেছ বলেই তার মা নও। খোকন বৌদির, একমাত্র তাঁর।

বেশ তো। তাতে কেউ তো বাধা দিচ্ছে না।

না। কিন্তু বোধ হয় বৌদি নিজের মনের মধ্যে নিজের যথেষ্ট জোর পাচ্ছেন না। পেলে নিজের একচ্ছত্র অধিকার প্রমাণ করতে প্রতিদিন এইভাবে মিথ্যে চেষ্টা করতেন না।

বাসবী কথাটা বুঝলে। অন্তত বোঝবার চেষ্টা করলে। বললে তা আমি আর কি করতে পারি বল ?

জানি না। বৌদি একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সেদিন রবিবার। বিকেলে চা খেয়ে বিমল একটু বেরুচ্ছিল। সুরমা এসে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি কোথাও বেরুচ্ছ নাকি।

বিমল বললে, হ্যাঁ। কেন ?

সুরমা একটু দমে গেল। তার চোখে মুখে হতাশার ছাপ ফুটে উঠল। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, একটু দরকার ছিল।

কি দরকার ?

আমার সঙ্গে একটু বাজারে যেতে।

কি ব্যাপার ?

খোকনের জন্যে ক'টা জিনিষ কিনতে হবে।

দাদা কোথায় ?

তাঁর অফিসে কি একটা পার্টি আছে। সেখানে গেছেন। তিনি থাকলে আর তোমাকে বলব কেন ? বলেছি কোনদিন ?

বিমল হাত জোড় করে বললে, না। এবং আজকেও বলবেন না।

কেন সংসারের এটুকু উপকার তোমাকে দিয়ে হবে না ?

না। সংসারের কোনো উপকারে এসেছি কোনোদিন ? সংসার আপনার, ছেলেও আপনার ! আমি 'আসি-যাই গুলি খাই মাথা দেখি না।'

বলে হাসতে হাসতে বিমল বেরিয়ে গেল। আর তার কথায় খুশী হবে, কি রাগবে, বুঝতে না পেরে সুরমা ন যযৌ ন তস্থৌ দাঁড়িয়ে রইল।

ও বারান্দা দিয়ে বাসবী যাচ্ছিল। সুরমা তাকে ডাকলে।

সুরমার ডাক শুনলে বাসবীর আজকাল মুখ শুকিয়ে যায়, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করে। তবু কাছে এল।

আসতে হল।

কি ?

ঠাকুরপোর কথা শুনলি ?

আড়াল থেকে একটু একটু শুনেছিল বাসবী। কিন্তু নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালে, না। সুরমার যা মেজাজ হয়েছে আজকাল। কোন কথায় কি ঝামেলার সৃষ্টি হয় কেউ জানে না।

বললাম আমার সঙ্গে একবার বাজার যেতে, খোকনের জন্যে কটা জিনিস কিনতে হবে।

বাসবী নিঃশব্দে শুনে যেতে লাগল।

তা কি বললে জানিস ?

বাসবী ঘাড় নাড়লে।

বললে, সংসার আমার ছেলেও আমার। তোমরা শুধু আস-যাও গুলি খাও।

বাসবীর হাসি এসেছিল। কিন্তু হাসতে সাহস করলে না।

মৃদু কণ্ঠে বললে, সংসারও আপনার, ছেলেও আপনার। ঠিকই তো বলেছেন।

হঠাৎ সুরমা বারুদের মতো ফেটে পড়ল : ঠিকই তো বলেছে! সংসার, ছেলে যে আমার নয়, সে আমিও জানি, তোরাও জানিস। ছেলে তোদের। যার ছেলে নেই তার সংসারই বা কিসের! কিন্তু সে কথা মুখের ওপর শুনিয়ে না গেলে চলত না? চলত না?

সুরমার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

আরও বার কয়েক বললে, চলত না? চলত না?

তার হাতে একখানা রেকাবী ছিল। খোকনের জন্যে ফল কাটা হয়েছে। তাইতে সাজিয়ে দেবে। সেখানা হঠাৎ ঝন ঝন শব্দে পড়ে দু'খানা হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও পড়ে গেল।

মূর্ছা।

তারপরে অনেকদিন কেটে গেল।

খোকন বড় হয়েছে। খাতা-পেন্সিল ব্যাগে করে চাকরের সঙ্গে স্কুলে যায়। বাইরের ঘরে মাষ্টার মশাই এসে রোজ পড়িয়ে যান।

কিন্তু সুরমার ফিটের অসুখ সারল না।

সময়টা ঠিক মনে নেই। কেবল এইটুকু মনে পড়ে যে, তখনও মাঠে পাকা ফসলের সোনালি বিছানা পাতা রয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় শীতের মিষ্টি আমেজ পাওয়া যায়।

কি একটা উপলক্ষ্যে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। ভোরের প্রভাতী গানে ঘুম ভাঙলো। দ্বৈত সঙ্গীত ঃ একটি কণ্ঠ ভারি এবং পরিণত, আর একটি কাঁচা কিশোর কণ্ঠ। পরিণত কণ্ঠটি চিনতে বিলম্ব হোল না। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে প্রতি বৎসর এই সময়টিতে শুনে আসছি।

আমাদের উদ্ধব দাসের কণ্ঠ। কিন্তু কিশোরটি কে? উদ্ধবের তো ছেলেপুলে নেই।

কথাটা সকালেই উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে যে গান গাইছিল ওটি কার ছেলে হে! বড় মিষ্টি গলা তো!

আজ্ঞে, কার ছেলে তা জানি না, ও নিজেও জানে না।

সে আবার কি!

আজ্ঞে, ঠাকুর ওটিকে জুটিয়ে দিয়েছেন শেষ বয়সে। নিজের তো ছেলেপুলে হোল না। তা গায় বড় ভালো।

সন্ধ্যার পরে উদ্ধব ছেলেটিকে নিয়ে এল আমার কাছে। চমৎকার দেখতে! রং ফর্সা নয়, কিন্তু মাথার ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলে, বড় বড় চোখে ভারি মিষ্টি চেহারা!

বললাম, একটা গান শোনাও দেখি।

গান শোনাতেই যে এসেছিল তা উদ্ধবের হাতের একতারা ডুবকিতেই বোঝা যাচ্ছিল। বলামাত্রই দু'জনে গাইতে আরম্ভ করলে,—একটার পর একটা, বিনা অনুরোধে, অনেকগুলো গান।

উদ্ধব গৃহী বাউল। বিঘেদুয়েক পৈত্রিক জমি আছে, সেটুকু নিজেই চাষ করে। বিবিধ পাল-পার্বনে সিধা পায়। বাড়িতে নিজে আর স্ত্রী। সুতরাং তাতেই চ'লে যায় তাদের। প্রচুর অবসর সময়ে গান গায়, নয় তো কাছাকাছি কোথাও মহোৎসব হচ্ছে, কিংবা বাউলের সমাবেশ হয়েছে শুনলেই চ'লে যায় সেখানে।

সঙ্গে চলে নন্দদুলাল মাথায় পুঁটলি নিয়ে আর সমস্ত পথ গানে গানে মুখরিত করতে করতে। যারা ওদের সঙ্গে চলে তাদেরও যেন পথচলায় কষ্ট হয় না।

চাষীরা বলে, বাবু মশায়, আমাদের অর্ধেক কাজ দুলালই ক'রে দেয়।

কি রকম?

আজ্ঞে হ্যাঁ। মাঠে যেদিন ও থাকে না, সেদিন মাটি যেন পাথর হয়ে যায়,—লাঙ্গল-কোদাল আর চলে না। আকাশে যেন দু'তিনটে সুয্যি ওঠে,—কাজ করতে পারি না।

কি করে ও?

কিছুই করে না। শুধু গোরু ছেড়ে দিয়ে গাছের ছায়ায় ব'সে গান গায়। তারপরে হঠাৎ এক সময় দেখি ধান-কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে,—একদিনের কাজ একবেলাতেই। গামছা-বাঁধা জলখাবার আলের মাথাতেই প'ড়ে আছে, খেতে মনেইছিল না।

তারা হাসে।

জিজ্ঞাসা করি কি গান গায়?

তারা হাত উলটে বলে, কি যে গায় সে ওই জানে মশায়, কিন্তু হাওয়ায় যেন নেশা লাগে। আশ্চয্যি কাণ্ড, গোরুগুলো পর্যন্ত নড়ে না যেন। যতদূর ওর গান শোনা যায়, তার বাইরে আর যায় না।

বিস্মিত হয়ে বলি, বলো কি হে!

আজ্ঞে হাঁ। বললে পেত্যয় যাবেন না ববুমশায়, কিন্তু নিজের

চোখে দেখিছি গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত ওর গান শুনে যেন ঝুলে পড়ে। ও চ'লে গেলে মাঠখানাও যেন কি রকম করে।

কি রকম করে?

ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে মনে-মনে ওরা যেন দৃষ্টান্ত হাতড়ায়। তারপর বলে, কি রকম জানেন, বাছুর হারালে গাই-গরু যেমন করে তেমনি যেন! যেন চকমক্ ক'রে কি যেন খোঁজে! কতদিন আমরা বলাবলি করেছি একথা, না হে!

সবাই গম্ভীরভাবে সায় দিল।

এর কিছু দিন পরে পাশের একটা গ্রামে গিয়েছিলাম জনসভায় বক্তৃতা দিতে। কম্যুনিজ্‌ম, সোস্যালিজ্‌ম, গান্ধীজ্‌ম্ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলাম। কেমন হবে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, কেমনই বা রাষ্ট্রব্যবস্থা,—কি ব্যবস্থায় মানুষ হবে সুখী, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান, তার জীবনে অধিষ্ঠান হবে সত্য-শিব-সুন্দরের, তাই নিয়ে অনেক মনোজ্ঞ কথা বললাম। বুঝিয়ে দিলাম, মানুষের মানে কি।

শ্রোতারা বললে, হ্যাঁ, একটা বক্তৃতা শুনলাম বটে! এমন কথা কোথাও শুনি না।

সেখান থেকে ফিরছিলাম, হাঁটা পথের রাস্তা। তখন অল্প রাত্রি হয়েছে। সামনেই একটা তালগাছের আড়ালে ত্রয়োদশীর চাঁদ। চারিদিকে যতদূর দেখা যায়, সমস্ত যেন চাঁদের আলোয় ভাসছে।

অবশেষে গ্রামের মাঠে এসে পড়লাম। নদীর ধারে এসে হাত-মুখ ধুচ্ছি, মনে হোল একটা অস্পষ্ট সুর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। খুব অস্পষ্ট, কান পেতে না শুনলে বোঝা যায় না। সেদিকে খেয়াল না রেখেই হাত-মুখ ধুয়ে আবার আমরা হাঁটতে সুরু করলাম।

আমাদের মধ্যে তখন 'মানুষের মানে' নিয়ে তর্ক উদ্দাম হয়ে উঠেছে: কী এর সত্যিকার মানে? সমাজ এবং রাষ্ট্র কার জন্যে?

কী তার লক্ষ্য ? সুখ এবং সমৃদ্ধি কি এক ? ঐশ্বর্য কাকে বলে ? এমনি কত কি দুরূহ এবং জটিল প্রশ্ন।

হঠাৎ এক সময় সমস্ত তর্ক স্তব্ধ ক'রে আমরা সবাই গেলাম থেমে !

বন্ধু বললেন, দুলাল গান গাইছে !

তাকে দেখা যায় না। কোথায় ব'সে গাইছে সে আবছা অনুমান করা যায় মাত্র। কিন্তু সে যেন গানও নয়, গানের জ্যোৎস্না,—তরঙ্গের পর তরঙ্গে সমস্ত প্রকৃতিকে যেন ভাসিয়ে দিচ্ছে। কি গাইছে ?

"ব্রহ্মাণ্ডের অগ্রভাগে আগে জাগে চোর,
পায়েতে লাল পাগড়ি, মাথাতে সোনার নুপুর !"

মানে কি ? মানুষের মানে কি ? সমাজ রাষ্ট্রের মানে কি ? 'তা দেখে নিত্য মানুষ উঠলো আশমানে !' কে নিত্য মানুষ ?

বামুনগ'ড়ের পাড়ে গুটি পাঁচেক তালগাছ ঘেঁষাঘেষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তারই মধ্যে বসে উদ্ধব আর দুলাল।

কি করছ উদ্ধব ? এখানে ব'সে গান গাইছ ?

আজ্ঞে গান নয় বাবুমশায়, গলা সাধছি। কোত্থেকে ফিরছেন ?

মদনপুর থেকে। বড় চমৎকার গাইছিলে যে !

এই ঘটনার বছর পনেরো পরে।

পুজোর বন্ধে বাড়ি গেছি, উদ্ধব নিঃশব্দে এক ধারে এসে বসলো।

কেমন আছ উদ্ধব ?

আজ্ঞে, ভালো নাই।

উদ্ধবের চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মাথার বড়-বড় চুল, আবক্ষলম্বিত দাড়ি পেকে কাশফুলের মতো ধব্‌ধব্‌ করছে। উদ্ধব একেবারে অথর্ব হয়ে গেছে।

আপনি অনেক দিন পরে গাঁয়ে এলেন বাবু!

হ্যাঁ ভাই। কাজের চাপ, খরচ-খরচা, ঘন ঘন দেশে আসতে আর পারি না।

—তাই বটে।

বললাম, অনেক দিন পরে এলাম উদ্ধবদাদা, মাকে আজ গান শোনাতে হবে যে! তুমি আর দুলাল।

উদ্ধব যেন চমকে উঠলো। বললে, দুলাল তো এখানে থাকে না বাবুমশায়।

কেন?

এখানে খাবে কি বাবুমশায়? কাঁচড়াপাড়ায় কি একটা কারখানার কাজ করছে। বছর পাঁচেক হোল।

এখানে আসে না মাঝে মাঝে?

ওই আপনারই মতো, কাজের চাপ···খরচ খরচা···

তা বটে। খোঁজখবর নেয় তো তোমাদের?

ন্ নেয়। মাঝে মাঝে ন্ নেয়। চিঠিপত্র লেখে।

কেমন আছে?

ব. ভালোই আছে শুনি। দিন চারটাকা মজুরী পায়। ভালো থাকারই তো কথা।

বাঃ! বেশ! শুনে সুখী হলাম।

কিন্তু উদ্ধবের মুখে সুখের কোনো চিহ্ন ফুটে উঠলো না। ভাবলাম, পূজোর দিনে অপত্য-বিরহেই এমনটা হচ্ছে। দুলাল বাড়ি আসতে না পারায় বুড়োর মনটা ভালো নেই।

বললাম, তা হোক। তুমি তো আছ। তোমর গানই শোনা যাবে সন্ধ্যের আরতির পর।

আমি তো আর গাই না বাবুমশায়।

সে কি!

আজ্ঞে, গান আর আসে না। একেবারেই আসে না।

আমি আর কিছু বললাম না। কেমন মনে হোল, গানের প্রসঙ্গেই ও যেন আসতে চায় না। চুপ ক'রে রইলাম।

একটু পরে উদ্ধব বললে, কাঁচড়াপাড়া ক'লকাতা থেকে কত দূর বাবুমশায় ?

কাছেই। কেন বল তো ? যাবে আমার সঙ্গে ?

আজ্ঞে না। তবে .....

তবে ?

আপনার কি সময় হবে বাবুমশায় ?

কিসের ?

ছেলেটার একবার যদি খবর নিতেন। এদানি অনেক দিন তাঁর খোঁজ খবর পাই নাই। বিদেশ বিভুঁই জায়গা।

একটু চিন্তা ক'রে বললাম, তোমাকে ঠিক কথা দিতে পারছি না উদ্ধবদাদা! তবে যাবার চেষ্টা করব। ঠিকানাটা আমাকে দিও বরং। নিজে না যেতে পারলেও কাউকে দিয়ে খবর নোব।

বিকেলে একখানা ছিন্ন মলিন পোষ্টকার্ড হাতে ক'রে উদ্ধব এসে উপস্থিত। বললে, এইতে ওর ঠিকানাটা আছে কিনা দেখুন তো ?

বললাম, আছে। কলকাতায় ফিরেই আমি খবর নোব। তুমি কিছু চিন্তা কোরো না।

এতক্ষণ পরে উদ্ধব নিঃশব্দে একটুখানি কাঁদলো।

কলকাতায় ফিরে দুলালের কথা যথারীতি ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময় উদ্ধবের একখানা চিঠি এলো। ছ' সাত দিন পরে আবার একখানা। বার বার সকাতর মিনতি করেছে, দুলালের খবরটা নেবার জন্যে।

কাজের চাপ ছিল যথেষ্ট। তবু উদ্ধবের মিনতি উপেক্ষা করতে পারলাম না। এবং পরের রবিবারেই চেপে বসলাম কাঁচড়াপাড়ার ট্রেনে।

ওদের কুলী-বস্তীতে যখন পৌঁছুলাম, তখনও সন্ধ্যা হয়নি। যেমন নোংরা বস্তি, তেমনি নোংরা রাস্তা! দু'ধারে সারি সারি খুপড়ির মতো টালির বস্তি। উন্মুক্ত, ছেড়া চটের সাহায্যে কোনো রকমে আব্রু রক্ষা করা হচ্ছে। প্রত্যেক ঘরের সামনের সরু জায়গাটুকুতে কোথাও হিন্দুস্থানী বৃদ্ধা ফরসীতে তামাক টানছে, কোথাও উলঙ্গ শিশুর দল ধূলো ওড়াচ্ছে, কোথাও মদের আড্ডা ব'সে গেছে।

এই অসংখ্য গুহার মধ্যে কোথায় আছে দুলাল!

অনেককে জিজ্ঞাসা ক'রে, অনেক পথ ঘুরে অবশেষে যখন তার বস্তির কাছাকাছি পৌঁছেচি, তখন একটি লোক আঙুল দিয়ে তার বস্তিটা দেখিয়ে দিলে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বললে, ওখানে নাই গেলেন বাবু।

কেন?

সে আপনার শুনে কাজ নেই।

কিন্তু আমার যে বড্ড দরকার বাপু!

তা'হলে যান।

একটা শব্দ আমার কানে আসছিল। যেন একটা স্ত্রীলোকের আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোক এসে জড়ো হয়েছে। অনেক পুরুষ এবং অনেক স্ত্রীলোক তাদের আড়ালে কিসের যেন একটা ধস্তাধস্তিও চলেছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে দুলাল বলে কেউ থাকে? দুলাল দাস?

লোকগুলো চমকে আমার দিকে তাকালে। আমার খাকি ট্রাউজার এবং শোলার টুপির দিকে। একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠলো, পুলিশ! দেখতে দেখতে অত বড় ভিড় ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু উঠানে পড়ে রইলো রক্তাক্ত, এবং বোধ হয় অচৈতন্যও, একটি স্ত্রীলোক, আর দাওয়ায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ব'সে রইলো দুলাল,—তার অনাবৃত বাহু দিয়ে রক্ত ঝরছে।

—তুমি দুলাল না? এসব কি কাণ্ড!

দুলাল আমার দিকে চাইলেই না। শ্রান্তভাবে চোখ বন্ধ ক'রেই টেনে-টেনে বলতে লাগলো : ধরে নিয়ে যাবে বাবা! নিয়ে যাও, আমি পরোয়া করি না। আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে গেল, জ্বলে গেল,—ঠিক যেন সাপে ছুবল দিলে গো, কালকেউটে সাপে। আমি আর বাঁচবো না।

ব'লে গড়িয়ে দাওয়া থেকে উঠানে প'ড়ে পাথরের মতো হয়ে গেল।

সেদিন ফিরতে আমার অনেক রাত্রি হয়েছিল। দুলাল এবং তার স্ত্রীলোকটির জ্ঞান না ফিরে আসা পর্যন্ত উঠতে পারিনি। আমি যখন উঠলাম, তখনও সম্বিৎ তাদের ফিরেছে বটে, কিন্তু নেশা তখনও কাটেনি।

প্রতিবেশীরা আমার মুখের অবস্থা দেখে সহাস্যে বললে, ভয়ের কিছু নেই বাবু। রোজ রবিবার ওরা এই রকম করে। বলি খাস না অত! তা শুনবে না।

তার পাশের লোকটি একেবারে আমার মুখের সামনে এসে বললে হাত ঘুরিয়ে, সে বলতে পারি আমরা। এই যে আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, কিন্তু পা টলছে এতটুকু? তার যো কি!

কিন্তু এসব শুনে আমার লাভ কি? মোট কথা, ভয়ের কিছু নেই। কিছুই নেই, না? তবু এই কথাটাই উদ্ধবকে কি করে যে জানাব, আজও আমি ভেবে পেলাম না।